গণ নায়িকা



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

~~3089~~

~~3089~~

ব্যর্থ নায়িকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮০

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীমোহিত সিকদার
সিমকো প্রিন্টস্ এণ্ড পাবলিকেশানস্
১৬, মারকাস লেন,
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ পট :
শ্রীশ্যামল নন্দী

চার টাকা

উৎসর্গ

স্বর্গত লেখকের ইচ্ছানুযায়ী

তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনীকে

১লা বৈশাখ, ১৩৭৯

১৯৪৬ সাল আর ১৯৬৭ সাল—গণতিতে কুড়ি বছর না হলেও—মোটামুটি কুড়ি বছরই বলা চলে। কুড়ি বছরের একটি নাটক। গোপার জীবন নাটক। সুরু হয়েছিল গোপার চৌদ্দ বছর বয়সে; আজ গোপার বয়স চৌত্রিশ। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অকল্পিত অচেনা প্রান্তরে এসে সে যেন একটা দিকদিগন্তহীন প্রান্তরের মধ্যে হারিয়ে গেল! অবশিষ্ট বাকী জীবন বুকে হেঁটে এই প্রান্তর ভেঙে চলা ছাড়া আর কিছু রইল না। এবং তার মধ্যে নতুন কিছু ঘটবারও আর প্রত্যাশা রইল না। এইটেই যেন শেষ ঘটনা। বিন্দুমাত্র ঘটা না করেই ঘটে গেল।

এরপর আর নাটক চলে না। একঘেয়ে একটি স্রোতের টানে ভেসে চলার মধ্যে যে গতি—তার সঙ্গে ছেদ পড়ার কোন তফাৎ নেই। ঘরের তক্তাপোষখানার উপর গোপা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

জীবন যে এমনভাবে অবশ্যম্ভাবী রূপে বিয়োগান্ত তা গোপা জানত না। মন বলছে—হয়তো নাটক এর জন্যে দায়ী নয়। দায়ী সে। সে এই নাটকের নায়িকা, সে-ই নাটককে সার্থক করে তুলতে পারলে না। হ্যাঁ। পারলে না। একালের মেয়ে, লেখাপড়াও কিছু করেছে; ঠিক যারা পাঁচপাঁচি—অতিসাধারণ বা ব্রাত্য—কাল বা যুগের ধ্যান ধারণা থেকে পিছিয়ে পড়া মেয়ে তা ঠিক নয়। তবে অবশ্য যারা অনন্যা অসাধারণ তাদেরও একজন নয় সে। এবং মাঝারি মেয়েদের মতই জীবনের দাবীকে জোর করে তুলে জীবনকে বিয়োগান্ত বলে মানতে সে প্রস্তুত ছিল না।

মানুষের মরাটা বিয়োগান্ত নয়। মানুষ মরবার জন্যেই জন্মায়—সব মানুষই মরে। কিন্তু সে হল সমাপ্তি। মৃত্যুর মধ্যে যে বিয়োগ—সে বিয়োগ সমাপ্তি। সে বিয়োগ বিয়োগান্ত নয়। কিন্তু জীবনের মাঝখানে এইভাবে সকল কল্পনায়, সকল ফুল ফোটানোর প্রত্যাশায়—জীবনের বিস্তারে ছেদ টেনে দিয়ে এইভাবে ব্যর্থতার মধ্যে ভেঙে পড়ার বা মধ্যপথে পথের পাশে সাঁটপাট হয়ে শুয়ে পড়ার মধ্যে যে ব্যর্থতার লজ্জায় ও বেদনায় ম্রিয়মাণ ও সকরুণ বিয়োগান্ত পরিণতিটি আপনা থেকে ফুটে ওঠে—তাকে কি করে অস্বীকার করবে? কি করে বলবে—আমার এই ভাল, এই ভাল। কি করে মুখ তুলে চাইবে? কি করে অস্বীকার করবে? স্বীকার-অস্বীকারের কোন অপেক্ষা না রেখেই রাত্রি যেমন করে দিন শেষ করে দেয় অন্ধকারের মধ্যে—ঠিক তেমনিভাবেই তার জীবন নাটক শেষ হয়ে গেল। জ্যোতি তার সকল কামনার কাম্য—নারী জীবনের আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ—পৌরুষে প্রেমে-স্নেহে সহযোগিতায় তাকে সে জয় করেছিল—সেও তাকে বরণ করেছিল—সারা অন্তর দিয়ে। আজ বিশ বৎসর কামনা করে এসেছে—প্রতিটি দিন পরস্পরকে কামনা করে এসেছে—একটি মিলন দিনও তারা স্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল। ব্যর্থ নায়িকা সে—সে পিছিয়ে এসে ভেঙে পড়ল। এগিয়ে যেতে পারলে না।

* * *

নিতান্ত বিশেষত্বহীন অতি সাধারণ দু-কুঠুরীর একখানা পুরনো বাড়ী।

নতুন কালে হিসেব করে তৈরী করা প্ল্যানসম্মত বাড়ীর স্বয়ং-সম্পূর্ণ অংশ, যাকে ফ্ল্যাট বলা হয়—তা নয়। এ হল সেই পুরনো কালের চকমিলান বাড়ী; চৌকো বারান্দার কোলে কোলে ঘর;

বারান্দাটাকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে কেটে কেটে আলাদা করা হয়েছে এবং এদিকে ওদিকে খানিকটা জোড়াতালি দিয়ে বাথরুম-রান্নার জায়গার সংকুলান হয়েছে কোন রকমে। তবে গোপাদের অংশটা নিচের তলায়—সামনের দিকটা, এই কারণে অন্য অংশগুলো থেকে অসুবিধে কম।

দুখানা ঘরের যেখানাকে সামনের ঘর বলা চলে—এবং এককালে যে ঘরখানা সত্যি সত্যিই সামনের ঘর ছিল—সেইখানাই দুখানা ঘরের মধ্যে সম্ভ্রান্ত এবং বাইরের পোষাকী সজ্জায় সজ্জিত।

এই খানাই গোপার জীবন নাটকের শেষ দৃশ্যের পৃষ্ঠপট বা ব্যাকগ্রাউণ্ড। ঘরখানা লম্বায় চওড়ায় অর্থাৎ আয়তনে ছোট নয়—ষোল ফিট বাই বারো ফিট হবে; কোন্ কালে ডিসটেম্পার করা হয়েছিল—পাতলা কলির আস্তরণের মধ্যে এখনও তার চিহ্ন ঘষা মোছা হয়েও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঘরের ভিতর আসবাবের মধ্যে একদিকে একখানা তক্তাপোষ আর একদিকে একখানা ছোট টেবিল এবং খান তিনেক চেয়ার একটা ভাঙা নড়বড়ে বুকসেল্ফ। একটা কাচভাঙা কাচের আলমারী। তার মধ্যে একটা থাকে খানকতক বই পরিপাটি করে সাজানো। খান চারেক রবীন্দ্র রচনাবলী, দুখানা শরৎচন্দ্রের রচনা সম্ভার, একখানা বসুমতীর ছাপা ছেঁড়া বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, এছাড়া বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী, মাণিক বাঁড়ুজ্জের বউ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি খানচারেক বই বেশ ঝরঝরে করেই সাজানো রয়েছে। একটা থাকে ছেঁড়া বইয়ের পাতা গাদা করা রয়েছে; তার সঙ্গে খানকয়েক ছেঁড়া মলাটও রয়েছে। যা হয়তো এখনও দপ্তরীর হাতে পড়লে বাঁধানো হয়ে নবকলেবর পেতে পারে। তার মধ্যে রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে, আবার সে কালের রাজলক্ষ্মী দামোদর গ্রন্থাবলীও আছে।

দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে মাত্র চারখানা ছবি—আর খানবারো ছবি টাঙাবার হুক—পেরেক সর্বাঙ্গে ঝুল জড়িয়ে বেরিয়ে রয়েছে—দৃষ্টিকে যেন খোঁচা মারছে।

চারখানা ছবির মধ্যে দুখানা হল ইতিহাসের ছবি—আর দুখানাকে ভূগোলের বলা যায়; অর্থাৎ নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি, একখানা কাঞ্চনজংঘার অপরখানা সমুদ্রের। ইতিহাসের ছবি বলতে দুটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির ছবি—একখানি রবীন্দ্রনাথের অপরখানি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের।

বাকী খালি জায়গাগুলোয় অর্থাৎ পেরেকগুলোর নিচে এককালে উনবিংশ শতাব্দীর বড়মানুষদের ছবি ছিল; রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, মাইকেল, দেশবন্ধু প্রভৃতির ছবি ছিল; সেগুলোর দড়ি জীর্ণ হয়ে হয়ে একে একে কেটে ছিঁড়ে আছড়ে পড়েছে মাটিতে এবং ভেঙে ভেঙে বাতিল হয়ে গেছে।

দেওয়ালে অনেককালের মালিন্য পলেস্তারার উপর জমে রয়েছে। ঝাড়াঝুড়ি হয় কিন্তু তাতে ওই মালিন্য মোছে না। সদ্য যে কলির আস্তরণ পড়েছে সে আস্তরণের মধ্যে যেন কেমন একটা ভিজে ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে দাগের আভাস ফুটে রয়েছে। সে থাক। পুরনো হলে এই দশাতেই আসতে হয়। জোয়ার ভাঁটা খেলা গঙ্গার ধারে কলকাতার মাটির উপর ইট চূণ সুরকীতে গড়া বাড়ী আর এর চেয়ে শুকনো এবং ঝরঝরে তাজা থাকে না।

গোপার পা যেন টলছিল। দেহের শক্তি যেন শেষ হয়ে গেছে কি যাচ্ছে।

জ্যোতিপ্রসাদকে বিদায় দিতে সে ঘরের দরজাটা খুলে দিল। বাইরে বের হবার দরজা। জ্যোতিপ্রসাদ দরজার মুখে একবার

থমকে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—এই তাহলে শেষ কথা?

ম্লান হেসে গোপাও মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে—আমি তোমাকে সব লিখেই জানিয়েছি। তাছাড়া—আর কি কথা থাকতে পারে বলো?

জ্যোতিপ্রসাদ বললে—আর একবার ভেবে দেখ।

বিষণ্ণ হেসে গোপা বললে—কি ভেবে দেখব?

অনেকক্ষণ, তা প্রায় আধ মিনিটকাল নিস্তব্ধ হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল জ্যোতিপ্রসাদ, তারপর বললে—তা হলে যাই।

—হ্যাঁ। যাও।

জ্যোতিপ্রসাদ চলে গেল। গোপা দরজা বন্ধ করে এসে—সেই তক্তাপোষটার উপর বিস্তৃত অনন্ত শয্যার মত সেই ছেঁড়া সতরঞ্চি এবং ময়লা চাদরখানার উপর নিজেকে এলিয়ে দিল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ভেঙে পড়ে যেন লুটিয়ে পড়ল—অদৃশ্য কালস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিল।

॥ দুই ॥

১৯৪৬ সালে নাটকের সুরু।

১৬ই আগষ্ট ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে হয়ে গেল; রাত্রে কলকাতার কতকগুলো অঞ্চলে আগুন লাগল; রক্তপাত হল; মেয়েদের আর্তনাদ উঠল; তা ছাপিয়েও সারারাত দুটি বিরোধী সম্প্রদায় চীৎকার করে ধ্বনি তুললে। একদল হাঁকলে বন্দেমাতরম—জয় হিন্দ। অন্যদল হাঁক তুললে—'আল্লাহো আকবর, নারায়ে তকদীর!'

কলকাতার নতুন সুগঠিত চাকচিক্যময় অঞ্চল—পার্ক সার্কাস। পার্ক সার্কাসেই বাসা ছিল গোপার বাবার।

না। পার্ক সার্কাসে বাসা ছিল বলে গোপার বাবা নরেশ গুপ্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। বড় চাকুরেও না। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। সেকালে আড়াইশো টাকা মাইনে পেতেন, দুই মেয়ে এক ছেলে এবং স্ত্রী—এই নিয়ে পাঁচ ছ জনের সংসার ছিল। তবে ধনী বা অবস্থাপন্ন মানুষ না-হলেও মনে-মনে মানুষটি ছিলেন জাত-অভিজাত, রীতিমত সংস্কৃতিবান মানুষ; জাত জানতেন না, ধর্ম সংস্কার এ সবের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না; পা জামা পরতেন, অনেকসময় খালি পায়ে থাকতেন এবং ঘুরতেন কিন্তু খালি গায়ে কখনও থাকতেন না; রবিবার রবিবার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেতেন; মেয়েরা গান গাইতে পারত, তারা উদ্বোধনী বা সমাপ্তি সঙ্গীত গাইত। এসব মহলে তাঁর খাতির ছিল।

নিত্য দাড়ি গোঁফ কামানো ধবধবে পাঞ্জাবী পা জামা পরা ঝরঝরে সংস্কৃতিবান মানুষ ; পার্ক সার্কাসে প্রতিবেশী মুসলমানদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। পার্ক সার্কাসে তিনি বাসাটা নিয়েছিলেনই তাঁর বন্ধু মহম্মদ কাদের সাহেবের আকর্ষণে। কাদের সাহেব তাঁর কলেজের সহপাঠী ছিলেন এবং কর্মজীবনে বিচিত্রভাবে একই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়েছিলেন। কাদের সাহেবের ছিল বাইরে ঘোরাঘুরির কাজ, গুপ্তবাবুর ছিল অফিসের কাজ, কলকাতার আপিসে তিনি ছিলেন এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে প্রথমতম কেরানী। যুদ্ধের কলকাতা তখন,—যুদ্ধপূর্বে নরেশ গুপ্তের মাইনে ছিল একশো পঁচিশ, যুদ্ধের বাজারে সেটা আড়াই শোতে উঠেছে ; এবং নতুন কালের যে হাওয়া উঠেছে—সেই হাওয়াতে নিশ্বাস নিয়ে এবং আড়াই শো টাকার কল্যাণে বাড়ীতে বড় খাঁচায় কয়েকটা লেগহর্ণ মুরগী পুষে বাসা নিয়েছেন পার্ক সার্কাসে। কাদের সাহেবই এই সুন্দর বাসাটি তাঁকে দেখে দিয়েছিলেন।

কাদের সাহেবের ভায়রার বাড়ী। পার্ক সার্কাস ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীমে কাঠা দশেক জমি কিনে যুদ্ধের বাজারে পাশাপাশি দুখানা দোতলা বাড়ী করেছিলেন ভদ্রলোক। নিজে একখানাতে থাকবেন—অন্যখানা ভাড়া দেবেন। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের স্কীমের একেবারে সীমান্ত ; অর্থাৎ শেষপ্রান্ত পূর্বদিকে তারপরই যে বস্তী এলাকা বা পুরনো কালের জের আজও দেখতে পাওয়া যায়—তাই তখন বেশ জমকালো হয়ে বর্তমান ছিল। এবং পার্ক সার্কাসের আগেরকালের বাসিন্দারা তখনকার রাজনৈতিক জোরে জোরালো হয়ে বেশ সগর্বেই নিজেদের জিন্দাবাদ ঘোষণা করত। তাদের এই এলাকার গা ঘেঁষে এই সভ্য বসতির একখানা বাড়ীতে সকল ধর্মের গোঁড়ামীকে অতিক্রম করে বাস করতেন নরেশবাবু।

নিচের তলায় থাকতেন তিনি এবং একটি বাঙালী খৃশ্চান পরিবার, উপরতলায় থাকতো একজন এ্যাংলো সায়েব এবং অন্যটায় থাকত এই কাদের সায়েব। পার্ক সার্কাসে তখন মুসলমান বিদগ্ধজনদের প্রাধান্য থাকলেও হিন্দু কম ছিল না—খৃশ্চানও ছিল। এ ছাড়া মাদ্রাজী-পাঞ্জাবী এবং খাস-ইংরেজদেরও বসতি ছিল।

উত্তর কলকাতা দক্ষিণ কলকাতার মত একজাতের পাড়া নয়। পার্ক সার্কাস তখন এখনকার চেয়ে অনেক গুণে বেশী কসমোপলিটান অঞ্চল ছিল। সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা এবং গোঁড়ামী আন্ত-র্জাতিকতায় খোলা অঞ্চলে এসে লজ্জায় মাথা হেঁট করে থমকে গিয়েছে ; অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে এলাকাটায় সীমানার দাগের বাইরে-বাইরে।

কাদের সায়েব বাইরে যেতেন—ওদের সুখসুবিধের ভালোমন্দের দেখাশুনো করতেন নরেশবাবু।

গোপা তখন বারো তেরো বছরের। গোপার দিদি—নীপার বয়স তখন ষোল—বড় দাদার বয়স আঠারো, সে স্কুল পার হয়ে কলেজে পড়ত।

জীবনের দিনগুলি যুদ্ধের দুঃসহ বাজারদরের পীড়ন—সাইরেন এবং বোমার দুঃসহ আতঙ্ক এসবগুলি পার করেছিল বলতে হবে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে। রেঙ্গুনে বোমা পড়তে কলকাতা থেকে মানুষেরা যখন পালাল তখনও ভাবেন নি বাসা ছেড়ে পালাবার কথা। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে যখন সত্যিই হাতিবাগানে বোমা পড়ল তখনও ছাড়েননি, ছাড়া দূরের কথা, এ বাসা ছেড়ে বা কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না তখন।

বিশেষ করে উত্তর কলকাতা বা কালীঘাট অঞ্চল, যেখানে ওইসব পুরনোকালের বাসিন্দেরা আজও তাদের ধর্মের

আচার আচরণ এবং বনেদীয়ানার চালচলন নিয়ে আটঘাট বেঁধে বসে আছে।

*　　*　　*　　*

নরেশবাবু উত্তর কলকাতা এবং কালীঘাট কালচার সম্বন্ধে একটা একটা গল্প বলতেন। গোপার সে গল্প আজও মনে আছে। বলতেন—একবার এক রবিবার দিন সন্ধ্যের সময় হঠাৎ একটা বিপদে পড়ে গেলেন। হেসে বলতেন—প্রথম যৌবন, খবর এসেছে স্ত্রী পীড়িত, মন কি আর মানে। বিকেলে টেলিগ্রাম এল—সত্যবতী ইল। তখন ওর বাবা পাটনায় থাকতেন। রাত্রি নটায় পাঞ্জাব মেল। হাতে টাকা নেই। ছুটে গেলাম নর্থ ক্যালকাটার এক ধনী বন্ধুর কাছে। টাকা ধার চাই। অন্তত: দুশো টাকা। কারণ সত্যবতীর চিকিৎসার জন্যে শ্বশুরমশায় টাকা খরচ করেন এটা আমি চাইনে। তা ছাড়া তাঁর অবস্থা বেশ ভাল নয়। ছা-পোষা মানুষ। বড় ডাক্তার দেখাতে পারবেনই বা কোথা থেকে। তখন ফি অবশ্য ষোল টাকা কিন্তু সে ষোল টাকার দাম অনেক। যাকগে। এখন নর্থ ক্যালকাটার ক্যারেকটার আর ট্রাডিশনের কথা বলি। বন্ধু ধনী হলেও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুই তুকারির বন্ধু। কলেজে আলাপ। কিন্তু যেতেই বললে—তাই তো রে নরেশ মুস্কিলে ফেললি! দুশো টাকা?

বললাম—তোরা লক্ষপতি—দু শো টাকাতে তোদের মুস্কিল?

সে বললে—জানিস নে রে। বলতেও ঠিক পারি নে। রবিবার তো। ক্যাশট্যাশ সব বন্ধ। তবে—।

—কি তবে?

তবে বাড়ীতে লোহার সিন্দুকের তহবিল একটা আছে। যেটাতে বংশের কোম্পানীর কাগজ আছে। মজুত মোহর আছে, বন্ধক

নেওয়া গহনাগাঁটী আছে অর্থাৎ বংশের যাকে মূলধন বলে তাই আছে তাতে। কিন্তু তার চাবী থাকে তার মায়ের কাছে। তিনি মালিক।

বললাম—দেখ ভাই মাকে বলেই দেখ।

বলা হল। মা বললেন—বাপরে—আজ তো সংক্রান্তি। আর এই ভরসন্ধ্যে—কি করে টাকা দেব। সব্বনাশ।—মা লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় হবেন। আমাকে বললেন নিতান্ত অসহায়ের মত—কিছু মনে করিসনে বাবা, তুই আমার ছেলের মত। কিন্তু সিন্ধুকের চাবী দেবার সময় শাউড়ী আমাকে এই প্রতিজ্ঞে করিয়েছেন। প্রতিজ্ঞে কি করে ভাঙি, বল, তুই বল ?

শেষ সুদ, চড়া সুদের কথা বললে বন্ধু। আমাকে সে চুপি চুপি বলেই দিলে—দেখ—তুই বল—চড়া সুদ দেব আমি। আর বন্ধক কিছু রাখ। সোনার চেন ঘড়ি আর বোতাম খুলে ধরে দে সামনে। তাহলে দেবে। না হলে ভাই, আমার মরা বাবা এলেও না—হ্যাঁ হবে না।

কি করব ? তাই দিলাম এবং তাই বললাম। বললাম—মা—এক কাজ করতে তো পারেন—কিছু বন্ধক রেখে সুদের সর্ত রেখে দিন—। তা হলে তো লক্ষ্মী বিদায় করা হবে না। যেমন বের করবেন তেমনি তো বন্ধকী জিনিস সিন্দুকে ঢুকবে।—

তখন বললেন—হ্যাঁ তা হতে পারে। হ্যাঁ, সে নিয়ম আছে, তা আছে। তবে মাসে সুদ শতকরা দেড় টাকা আর জিনিস যা রাখবে তার ছাড়াবার মেয়াদ ছ মাসের।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিলাম বোতাম আর চেন ঘড়ি। বন্ধুর মা বললেন—তা হলে বস। আমি আসছি।

বসে রইলাম। এরপর সে একটা যজ্ঞ বা স্বস্ত্যয়ন কিম্বা পূজা

অর্চনার ব্যাপার। চোখে আমি অবশ্য দেখিনি—তবে কানে শুনেছি।

বন্ধুর মা হাত পা ধুলেন—কাপড় ছেড়ে একখানা দুর্গন্ধযুক্ত খাটো রেশমের কাপড় পরলেন,—ধূপ ধূনো প্রদীপ জ্বেলে লক্ষ্মীর ঘরে গিয়ে বারকয়েক প্রণাম ট্রণাম করে—সিন্ধুক খুলে—হাত জোড় করে বললেন—মা শতকরা দেড় টাকা সুদে এই সোনার সামগ্রী বন্ধক রেখে তোমার কাছে ধার নিচ্ছি মা। ছ মাসের মধ্যে সুদে আসলে তোমায় শোধ করব।

বন্ধুর মায়ের সে গন্ধওয়ালা খাটো পাটের কাপড়পরা মূর্তিটি আমার মনে আছে। আমার সোনার দ্রব্যগুলি আর ছাড়াতে পারি নি। দুঃখ তাতে নেই। সোনার চেন বোতামের জন্যে আক্ষেপ হয় না। আক্ষেপ হয় সেই ঘড়িটার জন্যে। কলেজে ঢুকে প্রাইভেট টিউশনির টাকা থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। অক্ষয় অমর ঘড়ি। জলে ডুবিয়ে রাখলে থামত না, দরকার হলে ঢেলার মত ছুঁড়ে আম পাড়াও চলত। সেই ঘড়িটার জন্যে আজও দুঃখ হয়।

কালীঘাট আরও সাংঘাতিক। এখনও পুরনো বাসিন্দেরা কোমরে কাপড় জড়িয়ে—হ্যাঁ-লা, ও-লা বলে ঝগড়া করে; 'গাঁয়ে আর মানুষ নেই' বলে আক্ষেপ করে, পুলিশ দারোগার নাক কেটে নিতে চায় বঁটি দিয়ে।

বাপ!

এই পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে এসে মনের মত করে সংসার পেতে নিয়ে—ডিনার টেবিলে বসে নরেশবাবু এই গল্প করেছিলেন। সে কথা গোপার মনে আছে। সেই তার গল্পটা প্রথম শোনা। এরপর আরও অনেকবারই বলেছেন। যখনই কোন কারণে পার্ক সার্কাস

থেকে অন্য কোথাও যাবার কথা উঠত তখনই বলতেন। অথবা উত্তর কলকাতা ও কালীঘাট সম্পর্কে কথা উঠত—তখনই বলতেন। ওই গল্প ছাড়া আরও বলতেন—বাপ, উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর জিভ লকলক করছে—দক্ষিণে কালীঘাটে মা কালী খাঁড়া নিয়ে সদাজাগ্রতা—মধ্য কলকাতা আগলে আছেন মা ফিরিঙ্গীকালী। বহু কষ্টে পার্ক সার্কাসে এসে স্বস্তির নিশ্বাস নিয়েছি। এখান থেকে যাওয়ার কথাই ওঠে না।

আশ্চর্য! আশ্চর্য কি—তা বলতে পারবে না গোপা, হয়তো মানুষের ভাগ্য বলে যে একটি অদৃশ্য শক্তিকে মানুষ হাজার বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও এক একটা সময় স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই ভাগ্যই ওদের আশ্চর্য।

হঠাৎ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট রাত্রিকালে আরম্ভ হল ডাইরেক্ট এ্যাকশন। রাত্রিটা কাটল কোনরকমে, ১৭ই আগষ্ট সকালবেলা থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিদারুণ উৎকণ্ঠার বোঝা মাথায় করে বসে রইল গোটা পরিবারটি। ১৬ই রাত্রে কাদের সাহেব এবং তার ছেলে এসে তাঁদের সাহস দিয়েছিল এবং নিজেরা সত্যসত্যই আন্তরিক চেষ্টাও করেছিল তাঁদের রক্ষা করতে; ১৭ই দিনের বেলায়ও চেষ্টা করেছিল তারা, কিন্তু ১৭ই সন্ধ্যার পর তারা এসে বললে—যে কোন রকমে পারেন চলে যান এখন এখান থেকে। আর পারব না ওই গুণ্ডাদের ঠেকাতে। ওরা গুণ্ডা।

বাস, পার্ক সার্কাস ছেড়ে চলে আসতে হল; সেই দিনই হল। ইংরিজী মতে ১৮ই—বাংলা মতে ১৭ই শেষ রাত্রে সাড়ে তিনটের সময় জিনিসপত্র সব ফেলে রেখে কোনরকমে এসে উঠেছিল গলিটার পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে খান দশ-বারো বাড়ীর পরের একটা বড় বাড়ীতে; সে বাড়ীতে তখন তাদের মত পালিয়ে আসা

কতকগুলি পরিবারই এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু শুধু বস্তুর মাশুল দিয়েই মাশুল দেওয়ার শেষ হয়নি। জীবনের মাশুলও দিতে হয়েছিল।

বাবা নরেশবাবু গুণ্ডাদের ছোরায় খুন হয়েছিল। গোপার দাদা ছোরা খেয়েও বেঁচে গিয়েছিল কোন রকমে। তা ছাড়া—। আর মাশুল দিতে হয়েছিল দিদিকে।

নরেশবাবু আগলে নিয়ে আসছিলেন বড় মেয়ে নীপাকে। বড়দা সৌরীন আগলে আগলে আসছিল গোপাকে।

ভোর রাত্রি সাড়ে তিনটে বাজছে তখন। রাত্রির বীভৎস উল্লাস তখন ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ হল ঘুমিয়েছে মনে করেছিল তারা। কিন্তু না; ঘুমোয়নি, লোভে হিংসায় গুণ্ডাদের চোখে ঘুম আসেনি, তারা শুধু ঢুলছিল। এরই মধ্যে গোপাদের সন্তর্পিত পদক্ষেপ পথে বেজে উঠতেই তারা জেগে উঠে চোখ চেয়ে দেখেছিল; দেখেছিল—এরা পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কলরব তুলে কুটিল কুৎসিত উল্লাসে তারা ছুটে এসে তাদের আক্রমণ করেছিল।

প্রথমেই ছিল মেয়েরা। নীপা ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল একটা পাশের গলিতে। তার পিছনে তাকে রক্ষা করতে ছুটেছিলেন নরেশবাবু। এরা ছুটেছিল সোজা সামনে। এরা মানে মা গোপা আর সৌরীন। গুণ্ডারাও দুভাগ হয়ে দু'দলের পিছনে ছুটেছিল। শুধু শেষ রাত্রে উঠেছিল কয়েকটা চীৎকার, তার একটা নীপার, একটা নরেশবাবুর। বাকী কদর্য বীভৎস হাসি।

যাক।

নরেশবাবুর মৃতদেহের সৎকার করা সম্ভবপর হয়নি। দিদি নীপাকেও উদ্ধার করা যায়নি। তবে দাদা হাতের বাহুতে একটা ক্ষত নিয়ে এসে হিন্দুদের সেই বড় বাড়ীটা পর্যন্ত পৌঁচেছিল এবং

সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা পেয়ে বেঁচেছিল। এর বেশী আর কিছু করা যেত কি যেত না সে নিয়ে কোন কালে কোন প্রশ্ন কেউ তুলতে সাহস করেনি।

যেত না।

কারণ পরের দিন সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই গলিটায় হিন্দু নাম যাদের তাদের আশ্রয়স্থল সেই বড় বাড়ীটা থেকেও মেয়েছেলে ও আহত অক্ষমদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং এই সরিয়ে দেবার জন্যেও কম কষ্ট করতে হচ্ছিল না। বালিগঞ্জ বা কালীঘাট নয়, উত্তর কলকাতায় বাগবাজার-শ্যামবাজার অঞ্চলে।

বাগবাজার এলাকায় কাঁটাপুকুরে নরেশবাবুর এক খুড়তুতো ভাই থাকতেন। রক্তের সম্পর্ক সত্য হলেও আসল সম্পর্কটা নামেই ছিল। কারণ মানুষ হিসেবে প্রৌঢ় কবিরাজটি ছিল বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তবু তারই নাম ঠিকানা সেদিন মনে পড়েছিল এবং কোন রকমে এই ঠিকানাতেই এসে উঠেছিল তারা তিনজন।

গোপা, গোপার দাদা সৌরীন এবং মা। আশ্রয় পেয়েছিল। সন্ধ্যের মুখে গিয়ে কোন রকমে পৌঁচেছিল তারা। বাগবাজার সুরক্ষিত হিন্দু অঞ্চল হলেও সন্ধ্যে হ'তে হ'তে আতঙ্ক এবং আশঙ্কা যেন মাটি ভেদ ক'রে শীতকালের বাষ্পপুঞ্জের মত উঠে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত একটা কুয়াশার মত বিস্তৃত হতে চাচ্ছিল। তার মধ্যে তারা নেমে দাঁড়াতেই কয়েকজনেই হাঁ হাঁ করে উঠে জানতে চেয়েছিলেন কে? কে? কোত্থেকে আসছেন? কি? কি নাম? নরেশ গুপ্ত? পার্ক সার্কাস? কিন্তু দেশ কোথায়? সেনহাটী খুলনে? কি নরেশ মারা গেছে? খুন? ছোরা। কই বউমা? কই?

এরপর খানিকটা কান্না। কিন্তু বাড়ীর দরজা খুলে গিয়েছিল সাদর অভ্যর্থনার আহ্বানের সঙ্গে।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা কলকাতায় কার্ফু জারী হল।

*　　　*　　　*

কাঁটাপুকুর থেকে এই পুরনো বড় বাড়ীটার নিচের তলার সিকিখানা ভাড়া নিয়ে তার মা সংসার পেতেছিল ছ মাস পর। ১৯৪৭ সালে। কাঁটাপুকুর থেকে বেশী দূর নয়, কাছাকাছি; এবং নিরাপদ বলেই মনে হয়েছিল।

সেদিন হিন্দুদের মধ্যে খারাপ লোক আছে এ কথা স্বীকার করেও পার্ক সার্কাস এলাকার চেয়ে অনেক বেশী নিরাপদ বলে মনে করেছিল।

পার্ক সার্কাসে তাদের গিয়েছিল প্রায় সর্বস্ব। জিনিসপত্র আসবাব ইত্যাদির কিছুই পায়নি এক রকম। সে নিয়ে তারা গণ্ডগোল করতেও যায়নি। পাবার মধ্যে পেয়েছিল নরেশবাবুর পরিত্যক্ত কিছু অর্থ। ব্যাঙ্কে মজুদ ছিল হাজার দেড়েক, ইনসিওরেন্সে পাওয়া গিয়েছিল আড়াই হাজার আর আপিসের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে পেয়েছিল পাঁচ হাজার সাতশো কত টাকা কত আনা যেন।

এইখানেই গোপার জীবনে অকস্মাৎ এল নাটকীয়তা।

॥ তিন ॥

১৯৪৭ সাল—জুন মাস।

কলকাতার হাওয়া তখন দিক বদল করেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে, স্বাধীন হবার পূর্বে ভাগ হচ্ছে দেশ। বাংলাদেশ কেটে হু'ভাগ হচ্ছে। পূর্ব বাংলা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমবাংলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।

কলকাতা পড়ছে ভারতবর্ষে। হাওয়া ফিরে গেছে খবরটার সঙ্গে সঙ্গে। পার্ক সার্কাসের অনেক মুসলমান ঢাকা বা পূর্ব পাকিস্তানের কোন শহরে চলে যাচ্ছে, বাড়ী ওখানে খালি হচ্ছে। কাদের সাহেব ভাবছেন চাকরী ছেড়ে চলে যাবেন কিনা। তাঁর ভায়রাভাই, বাড়ীর মালিক যিনি তিনি চলে যাচ্ছেন ঢাকায়। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন কে তাঁর পার্ক পার্কাসের এই বাড়ীর সঙ্গে ঢাকার বাড়ী এবং সম্পত্তির বদল করতে পারে। এরই মধ্যে এই বাড়ীখানায় এসে উঠেছিল গোপারা। গোপার জ্যাঠা, কাঁটাপুকুরের কোবরেজ মশাই-ই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন যা ঘটবার ঘটে গেছে। ভাগ্যের একটা ফল আছে। তবে কর্মটা করে যেতে হয় ধর্মের পথে। তাতে হয় এই যাই ঘটুক আপশোষ হয় না। নরেশের—। থাক নরেশের কথা। যা হবার হয়ে গেছে। ভুলে যাও সে সব। এখন নতুন করে আরম্ভ কর। কাছেই রইলাম আমি। হ্যাঁ যা যখন দরকার হবে বলবে।

অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে যা বলা উচিত যা সকলেই বলে থাকে সব দেশে বলে থাকে তাই।

১৯৪৭ সালের মাঘ মাসে, ইংরেজী ফেব্রুয়ারীতে বাসা পাতা হয়েছিল ; একটা বাংলা 'দ'য়ের আকারের ছোট গলি অর্থাৎ একখানা গাড়ী যায় এমন গলি ; তারই প্রায় ভিতরের দিকে বাড়ীটা। দাদা সৌরীনের কলেজ ছিল সেণ্ট জেভিয়ার্স ; গোপা ওই দিকের একটা ইস্কুলে পড়ত ; এখন ভর্তি হ'ল উত্তর কলকাতারএকটা ইস্কুলে।

মানুষজনের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা হয়নি, তবে লোকে আঙুল দিয়ে দেখাতো তাদের, আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত—ওদের একটা যুবতী মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে। বাপটার পেটটা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ফাঁসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। হঠাৎ তবে তার মধ্যে নাটকীয়তা নেই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হবে। সেই উপলক্ষে গলিটিতে একটি ভলাণ্টিয়ার দল তৈরী হবে। এই ভলাণ্টিয়ার দলের অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়াল তার দাদা সৌরীন। সে কুচকাওয়াজের সঙ্গে পরিচিত ; শুধু তাই নয়, পার্ক সার্কাসে সে একটা ব্যাণ্ডপার্টি তৈরী করেছিল। এখানেও সে সেই ভূমিকা নিয়ে মাত্র তিন-চারদিনের মধ্যে গোটা পাড়াটার মধ্যে একজন মাতব্বর তরুণ হয়ে গেল।

সৌরীনের পিছনে পিছনে এল গোপা।

সৌরীনের সাদা খদ্দরের ফুল প্যাণ্ট, সাদা সার্ট, মাথায় ১৯৪৭-এর আইন মত গান্ধী টুপি, বুকে পৈতের ঢঙে টকটকে লাল খদ্দরের একটা চওড়া ফেটি। গোপার পরণে খদ্দরের লাল পাড় শাড়ী, লাল হাতা খদ্দরের ব্লাউজ আর ঐ পৈতের ঢঙের ফেটি, রুখু এলানো চুলে একটা লাল রিবন। মেয়েদের দলে সে আগে থাকতো। সেই সময় এলো জ্যোতিপ্রসাদ। জ্যোতিপ্রসাদ থাকত ছেলেদের দলের আগে। সৌরীন জায়গা নিয়েছিল দুই দলের সর্বাগ্রে, সে ছিল ভলাণ্টিয়ার দলের সর্বাধিনায়ক।

পাশাপাশি ছেলের আর মেয়ের সারি।

পাশাপাশি জ্যোতিপ্রসাদ আর গোপা ছুজনে বইছে ছুটো তেরঙ্গা ঝাণ্ডা। আরও একটা ঝাণ্ডা ছিল তাদের ক্লাবের ঝাণ্ডা। সেটা থাকত ব্যাণ্ডপার্টির সামনে।

সামনে দৃষ্টি রেখে মাথা উঁচু ক'রে মার্চ করে চলত—লেফট রাইট লেফট রাইট, লেফট রাইট, লেফট রাইট, লেফট রাইট। চল্ চল্ চল্, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণী তল—অরুণ প্রাতের তরুণ দল—চলরে চল চলরে চল……চল চল চল।

অমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলার তাজমহল।

চলরে চল চলরে চল চল চল।

কারুর অবসর ছিল না কারুর দিকে তাকাবার। বুকের ভিতর ছিল আশ্চর্য একটা উদ্দীপনা উৎসাহ—সে দিনগুলি ছিল আশ্চর্য দিন।

জুলাই মাসের ১৫ই, ১৬ই থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত একটা মাস সকাল থেকে সেই রাত্রি পর্যন্ত বিরাম ছিল না, বিশ্রাম ছিল না; শুধু মার্চ লেফট রাইট, লেফট রাইট, লেফট রাইট।—

—রাইট টার্ণ—।

—হল্ট।

লেফট রাইট, লেফট রাইট, লেফট রাইট।

"উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব নব প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত;
বাধার বিন্ধ্যাচল!
চলরে চল, চলরে চল চল্ চল্ চল্।"

কেউ কারুর দিকে তাকায়নি। না। ঠিক হল না। কতবার তাকিয়েছে, কিন্তু সে তাকানো তাকানো নয়! না নয়।

কথাটার মত সত্য কথা আর হয় না। তাকিয়েছিল অনেকবার। হয়তো বা বারবার, এক মিনিট দু'মিনিট অন্তর, কখনও পায়ের দিকে কখনও হাতের দিকে কখনও মুখের দিকে এমন কি চোখে চোখে মিলিয়ে নীরবে কথাও হয়েছে।

এই ঠিকানাতেই এসে উঠেছিল তারা তিনজন।

সৌরীন হুকুম হেঁকেছে মা-র্চ—

সঙ্গে সঙ্গে দুজনের চোখ দুজনের দিকে ফিরেছে, মিলেছে, ইসারায় বলেছে চল। পায়ে পা মিলিয়ে চল। মার্চ। কিন্তু তবু একথা সত্য যে কেউ কারুর দিকে তাকায়নি। হয়তো ঠিক হল না চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে মন অন্যের চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার মনকে খোঁজে সে মনে মনে দেখা তাদের হয়নি। অবসর ছিল না। এতটুকু সচেতনতা ছিল না যে, সে একটি মেয়ে এবং জ্যোতিপ্রসাদ একটি ছেলে। তখনকার দিনে আজকের থেকে অনেক অল্প বয়সে বাল্য কৈশোর কেটে যেতো। ষোল সতের বছরে বিয়ের বয়সও হয়ে যেতো অনেকের ভাগ্যে। চৌদ্দ বছরের পর আর তখন ফ্রক পরলে বিশ্রী দেখতো। লোকে ছি ছি করত। নিজেরও মনে হত। আজকাল কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ের মন সে কালে ষোল-সতেরোতেই পেতো।

ছেলেদের কথা বলতে পারে না— ; পারে নাই বা কেন। নিশ্চয় পারে। ছেলেরা তাই পেত। সে কালের ষোল বছরের জ্যোতি-প্রসাদ অনায়াসে এ কালের বাইশ বছরের পুরুষের দেহমনের পরিপক্কতা দাবী করতে পারত।

তখন তার বয়স চৌদ্দ, জ্যোতির বয়স সতেরো। ষোলোর উপর। কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে কোন কথা হয়নি, হতে পায়নি।

কালটা যেন সকল কাল থেকে পৃথক, সৃষ্টিছাড়া একটা বিচিত্র কাল ছিল। "পরাধীনতার অবসান হচ্ছে—স্বাধীনতা আসছে।"

১৯৬৭ সালের এই বসন্তরজনীর দ্বিতীয় পদে তক্তপোষের উপর ভেঙেপড়া গোপা অকস্মাৎ কেমন বিভ্রান্তভাবে বিচিত্র দৃষ্টিতে সামনের স্যাঁৎসেঁতে ছোপধরা দেওয়ালটার দিকে অর্থহীনভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাতে ভর দিয়ে উঠে ব'সেছিল ।

—আশ্চর্য। আশ্চর্য একটা কাল। সেই অন্তত কয়েকটা মাস। আশ্চর্য কাল। সকল কালেই কালের প্রভাব আছে। নানাভাবে নানান ভঙ্গিতে আছে। গ্রীষ্মের উত্তাপে বর্ষার বর্ষণে বন্যা-প্লাবনে, শীতের অসাড় পঙ্গু করে দেওয়া শীতে, বসন্ত কালের জীবনোল্লাসে আছে—মানুষের দেহে তার প্রভাব বিস্তার করে। আবার যুগের ভাবে ভাবনায় তার প্রভাব আছে। বিয়াল্লিশ সালের পর থেকে ছেচল্লিশ—তাই বা কেন, সাতচল্লিশ পর্যন্ত একটা বিচিত্র কাল গেছে। রাত্রির পর রাত্রি ময়দানে, ম্যাসাজ ক্লিনিকে এম্পটি হাউসে, পাঞ্জাবীদের ট্যাকসীতে সে একটা নেশার রাজত্ব চলেছে। আরম্ভ হয়েছিল পেটের দায়ে, শেষ হল সেটা নেশার টানে।

বইয়ে কাগজে পড়েছে সে যে অভাব এর হেতু। অবিশ্বাসের কিছু নেই। মূল হেতুটা তাই। কিন্তু পরে তাতে যে ফুল ফুটেছে ফল ধরেছে তা মহুয়া ফুল ও ফলের মত—তা থেকে চোলাই করে মদ হচ্ছে।

হরিহরছত্রের মেলার কথা তার মনে পড়ছে। রাস-পূর্ণিমায়, হরিহরনাথের মাথায় গঙ্গাজল ঢালবার জন্য মানুষেরা ছুটে যেত। মানুষ যেত বলে দোকান যেত। মানুষ আর দোকান মিলে মেলা হল। মেলা যখন হল তখন হরিহরনাথের মাথায় জল ঢালার

লক্ষ্য চাপা পড়ে গেল—হাতি-ঘোড়া, উঠ-গরু বিক্রির কারবারের আড়ালে। রাত্রিকালেও হরিহরনাথের রাজত্ব বজায় রইল না। সেখানে স্বাভাবিকভাবে এসে বসল বাঈজীদের তাঁবু; ইলেকট্রিক আলোর সমারোহের মধ্যে ম্যাজিক, সার্কাস, নাগোরদোলা, মদের দোকান, রেস্তোরাঁ, খাবার দোকান, বিশ্রামকুঞ্জ।

যুদ্ধের বাজারে ময়দানের মেলার বিকিকিনির মতো হাওয়া যখন বিয়াল্লিশের সাইক্লোনের—মাঠের ফসল গাছের ফল বসতি ঘরবাড়ী বিপর্যস্ত করে দেওয়ার মত সমস্ত কিছুকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। যখন কোন কিছুরই মূল্য আর ছিল না—তখনই আরম্ভ হয়েছিল, ছেচল্লিশের দাঙ্গা।

বাবা খুন হয়েছিল।

দিদিকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল।—

না। আজ আর সত্য কথাকে গোপন করবে না গোপা। কি লাভ? স্বীকারই করবে। তার দিদি 'নীপা'কে কেড়ে নিয়ে যাওয়াটা আধা সত্য। সে ইচ্ছে করেই গেছে। নীপাই এ ইসারা দিয়েছিল—কাদের সাহেবের ভায়রাভাই বাড়ীওলা কাসেম আলির ছেলে ওসমানকে।

ওসমানের সঙ্গে নীপার পরিচয় গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছিল নানান বিচিত্র পথে। দুটো নদী পাশাপাশি বইবার সুযোগ পেলে মাঝখানে কোন উঁচু বাঁধ কি পাড়ের বাধা না থাকলে—কিছু দূর এগিয়ে মিলবেই। আবার নিচু জমির দেশ পেলে একটা নদী পাঁচটা দশটা ফ্যাকরা মেলে আরও নিচুর দিকে ছুটবেই।

তাদের বাড়ীর ধারা ধরণ ছিল প্রশস্ত সমতলের মত। কোন বাধা বা বাঁধ ছিল না জীবনের স্রোতকে বেঁধে চালাবার জন্য। আবহাওয়া ছিল আকাশ লোকের আবহাওয়া। মর্তালোকের ধূলি

সেখান পর্যন্ত পৌঁছুতো না। জাতবিচারের বা ধর্মগত আচার আচরণের ক্ষুদ্রতা ও তীব্রতা তাকে সংকীর্ণ বা ঝাঁজালো করে তুলতে পারেনি। তার ওপর এক কম্পাউণ্ডের মধ্যে তুখানা বাড়ী। এ-বাড়ীর কুকুর মুরগী ও-বাড়ীর কুকুর মুরগীর সঙ্গে মেলামেশা সুরু করেছিল প্রথম। তারপর মানুষেরা। বাবার সঙ্গে কাদের সাহেবের ভায়রাভাই কাসেম আলি। ওদের মেয়ে জুলি (জুলেখা) ছিল—নীপা এবং গোপার মাঝের বয়সী, সুতরাং তুজনের বন্ধু। খৃশ্চান নিখিল বিশ্বাসদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও তাদের বন্ধু ছিল। মণিকা পড়ত তার সঙ্গে। কালটা ছিল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল। সম্পন্ন ঘরের রূপবান ছেলে ছিল ওসমান আলি। ব্যবসা করত; তখনকার দিনের একটা রাজনৈতিক দলের পাণ্ডাও ছিল কাসেম আলি; এবং ছেলে ওসমান কতকটা সেই উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ে উঠেছিল ছোটখাটো একটি যুব দলের নেতা; ওসমান আলির ভলান্টিয়ার কোর ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল বস্তীর বাসিন্দা। ভলান্টিয়ার ছাড়া সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল ওসমানের। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হত সেখানে। ওসমান আলি আরও অনেক কিছু ছিল—সারা যুদ্ধের কালটা জুড়ে ছিল এ. আর পি-র একজন হোমরা-চোমরা ওয়ার্ডেন; সাইডকারওলা একটা মোটর-সাইকেল ছিল—তার উপর চড়ে ঘুরে বেড়াতো। সে সাইডকারে জুলি চড়ত, তার সঙ্গে ওসমানের মেসো কাদের সাহেবের ছেলে-মেয়েরা—ছেলে রহমান, মেয়ে জুবিদা, রাবেয়া এরাও চড়ত। তাদের সঙ্গে সময়ে সময়ে নীপা-গোপাও চড়েছে। এছাড়াও আরও একটা উপলক্ষ্যে নীপা গোপা চড়ত সাইডকারে।

ওদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নীপা গান গেয়ে এবং গোপা আবৃত্তি করে প্রাইজ পেয়েছিল। তারপর থেকে ফাংশন হলেই ওপ্‌নিং সং

গাইবার জন্য ওসমান এই সাইডকারে বসিয়ে নীপাকে নিয়ে যেত, সঙ্গে যেত গোপা। সুতরাং এমন একটি সম্পন্ন অবস্থার রূপবান তরুণের সঙ্গে একটি সতের বছরের মেয়ের বাধা কোথায়? অস্বাভাবিকই বা কিসে?

মনের দাবী থেকেও কালের দাবীই ছিল বড়। এ কালের দাবীটাই ছিল—মিলনের দাবী যদি মন থেকে ওঠে তা হলে সমাজের দাবী জাতের দাবী ধনসম্পদের দাবী কোন দাবীই চলবে না। কিন্তু তবু দাবীটা শ্লোগান হয়েই থেকে গিয়েছিল—সমাজ জীবনে জাতীয় জীবনে আইন হয়ে পাশ হয়নি। সেই কারণেই এই অনুরাগের কথাটা গোপনই থেকে গিয়েছিল; ওসমান বা নীপা কেউই প্রকাশ করতে পারেনি। তবে ওসমান দু-চারবার নীপাকে বলেছিল—একদিন চল না তুজনে চাল যাই কলকাতা থেকে। সেখানে গিয়ে বিয়ে করে ফিরে এলে বাস্ সব ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু নীপা তা সাহস করেনি। হাঁ বলেনি। না-ও ঠিক বলে নি, নিরুত্তর থেকেছে। হঠাৎ বাধল দাঙ্গা। এবং ১৭ই তরিখ সন্ধ্যার সময় সব ফেলে পালানো ছাড়া যখন উপায় রইল না, তখন কাদের সাহেব নিজে এসে নরেশবাবুকে বললে—দাদা—আর এ বাড়িতে থাকবেন না। আপনি ছেলে মেয়ে নিয়ে যান। ওই বড় রাস্তার ওপর চ্যাটার্জিদের বড় বাড়ীখানায় হিন্দুরা একটা ঘাটি করে রয়েছে; এখান ওখান থেকে পালিয়ে আসছে ওখানে; ওখানেই যান আপনি। নইলে বিপদ হবে। এ বাড়ির পর আর হিন্দু বাড়ি নেই —তা ছাড়া বস্তীর গুণ্ডাদের নিয়ে ওসমানের ভাবগতিক ভাল লাগছে না। আপনি চলে যান।

সেদিন জাবনের সবটুকু সাহস ছিল কাদের সাহেবের প্রীতি এবং মনুষ্যত্বকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে। কাদের সাহেব অপ্রীতিকে প্রশ্রয়

দেননি, মনুষ্যত্বকেও হারাননি; হারিয়েছিলেন নিজের সাহস। সঙ্গে তাঁদের গোটা বাড়িটার সকলের সাহস ভেঙ্গে পড়ল।

কাদের সাহেব, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের বাড়ি থেকে বের করে পথে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। —চলে যান। আমরা রয়েছি পিছন আগলে। যান।

গোপার মনে পড়ছে। গোপা তখন সব ভুলে গিয়ে আতঙ্ক বিহ্বল এক বিচিত্র দেহমন নিয়ে সামনের দিকে টলতে টলতে এগিয়ে চলছিল। হাত পঞ্চাশেক জনশূন্য একটা পথের অংশ। পঞ্চাশ হাত দূরে হিন্দুদের সেই বাড়ীটার ফটক—সেখানে কতকগুলি ছেলে দাঁড়িয়েছিল। ওরা চলছিল যথাসাধ্য দ্রুতপদে। কিন্তু পা ঠিক দ্রুত চলছিল না। কারণ সর্বাঙ্গে একটা কম্পন অনুভব করছিল।

বাবা চলছিলেন নীপার সঙ্গে। নীপার প্রতি একটা অদৃশ্য দৃষ্টি যে নিবদ্ধ হয়েছে সে কথা তারা অনুভব করছিল, সেটা আর গোপন ছিল না।

হাত বিশেক এগিয়েছিল তারা। পিছনে কাদের সাহেব এবং তাদের বাড়ির অন্যেরা অর্থাৎ খৃশ্চান পরিবারের ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়েছিলেন। পিছন থেকে কেউ ছুটে এলে বাধা দেবেন এ সংকল্পও তাঁদের ছিল। সেদিক থেকে কোন গুণ্ডাও আসেনি। এল, ওই হাত বিশেক পর ডান হাতি যে একটা গলি বেরিয়ে গেছে উত্তরমুখে, সেই গলি থেকে। গলি থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল চার-পাঁচ জনের একটি দল। সকলের সামনে ওসমান।

ওসমানকে দেখে নীপা থমকে দাঁড়াল।

ওসমান ডাকলে নীপা!

মুহূর্তে কি হয়ে গেল নীপার। সে ডানদিকের গলির দিকে মোড়

ফিরে ছুটল। বাবা ছিল খুব কাছে—বাবা খপ করে তার হাত চেপে ধরলে—চীৎকার করে বললে—নীপা।

নীপা নিজের হাতখানা সজোরে টেনে ছাড়িয়ে নিতে চাইলে এবং বাবা থেকেও জোরে চীৎকার করে উঠল—না।

বাবা আর একবার চীৎকার করেছিল—নীপা—।

সঙ্গে সঙ্গে কে যে ছুটে এসে তাঁর পেটে ছোরা মেরে গোটা পেটটাকে চিরে দিলে তা দেখেনি গোপা। কিন্তু বাবা পড়ে গিয়েছিল। দাদা ছুটেছিল সাহায্য করতে। ওদিকে ঐ সামনের বাড়িটা থেকে জনকয়েক অসম সাহসী ছেলে ছুটে এসেছিল তারপর একটা গোলমাল। সব যেন একটা দুর্বোধ্যতার মধ্যে হিজিবিজি হয়ে একাকার হয়ে গেছে তবে সে এইটুকু বলতে পারে। যে, ওসমান তাকে কেড়ে নিয়ে যায়নি। নীপা নিজে ছুটে চলে গিয়েছিল। ওসমান যে তাদের বাবাকে ছুরি মেরেছে,—অন্তত, তারই হুকুমে এটা হয়েছে তাতে কোন ভুল নেই কিন্তু নীপাকে কেউ জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়নি। নীপা নিজে ছুটে গিয়েছিল।

নীপা তার কামনার আকর্ষণে ছুটে চলে গিয়েছিল। নীপা আজও বেঁচে আছে।

গোপা নীপার কাছে জুলির কাছে রাবেয়ার কাছে জীবনের অনেক কথা শিখেছিল তখন। তবে নিজের সর্বাঙ্গ জুড়ে বর্ষার জলে ভরে ওঠা নদীর মত যে দেহ ভরে ওঠার একটা পালা শুরু হয়েছিল— তার বিস্ময় আর আবেগও তার কাছে অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত ছিল না। বরং পার্ক সার্কাসে থাকতে এ সব বিষয়ে যেন সচেতনতা একটু তীব্রই ছিল। কিন্তু সব যেন কেমন অদল-বদল হয়ে গেল। উল্টেপাল্টে গেল।

তারপরই এল ১৯৪৭ সালের সেই বিচিত্র কাল। অশ্বমেধের শ্বেতাশ্বের মত একটি জয় পতাকা আঁকা একটি কাল।

সেই কালে সে জ্যোতির সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনেই পতাকাবাহী হয়ে মার্চ করেছে; সেই মার্চের প্রয়োজনে বারবার পরস্পরের দিকে তাকিয়েছে; চোখে চোখে কথা বলেছে।

—কি? পা বাড়াব এবার?

—বাড়াবে কি? বাড়াও! আমি এই বাড়াচ্ছি—লেফট—

—চল। রাইট।

তা হলে জ্যোতির সঙ্গে সত্যিকারের দেখা কবে হয়েছিল? অনেক পরে।

১৯৪৭ থেকে ৪৮।৪৯।৫০।৫১ সাল চার বছর পর। চৌদ্দ আর চার আঠারো হয়েছে তখন তার বয়স। কৈশোর তখন শেষ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে—পাশ করেছে। যৌবন তার জীবনে তখন কচি সতেজ চারা গাছের মত সোজা হয়ে মাথা তুলে উঠেছে; কিন্তু ফুল ফোটার সময় তখনও আসেনি।

গোপা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু হাসলেও; একটুকরো বিষণ্ণ ম্লান হাসি; বর্ষার সময় অমাবস্যার পর দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার বাঁকা চন্দ্রলেখার মত।

পৃথিবীতে কিশোরী বয়স থেকেই মেয়েদের দেহে শিহরণ জাগবার আগে থেকেই মনে শিহরণ জাগে; জাগে নয় জাগায়। জন্তুদের এ অকাল জাগরণ হয় কি-না সে তা ঠিক বলতে পারবে না তবে সে মানুষের মেয়ে মানুষী সে বলতে পারে মানুষীদের মনের মধ্যে এই অকাল শিহরণ মানুষেরা ব্যবস্থা করে জাগিয়ে দেয়। ছবিতে গল্পে গানে—অল্প বয়সী বেশী বয়সী পুরুষদের ইসারায়, ছুঁড়ে মারা কথায়, হাসিতে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেয়।

কলকাতা শহর। ১৯৪৮।৪৯ সাল। দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার মধ্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ করলে যে সব তরুণ বীর তাদের একটা দল বীরত্বের দাবীতে সংকটত্রাতা হিসেবে, কৈশোরে সদ্য উপনীতা থেকে যুবতী পর্যন্ত মেয়েদের কাছে বরমাল্য দাবী করছে তখন। বরণ না করলে হরণ করতেও তারা পিছু হটতে চায় না।

মেয়েরা পথে বের হলে শিস চিরকাল পড়ে—আগেরকালে পড়ত একালেও পড়ে ; ১৯৪৭-৪৮ সালে সিটি পড়ত। একটা সিটি এখানে পড়লে মোড় পর্যন্ত চার-পাঁচটা সিটি বেজে উঠত। মধ্যে মধ্যে পানের দোকান গলির মোড় থেকে কথা ভেসে আসত। পাশ দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে আগন্তুক সুন্দরেরা বিদ্যাদের সঙ্গ-সুখ কামনা জানিয়ে কটাক্ষ হেনে চলে যেত।

শুধু এখানেই শেষ নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যেই তারা গা টিপে হেসে-হেসে কতজনের কত অনুরাগ তার পায়ের তলায় ঢেলে দিয়েছে সে কথা বর্ণনা করেছে। নারী দেহের এবং নারীজীবনের যে রহস্যগুলি সমাজ ও সভ্যতার গোপনতার গভীর কূপের মধ্যে সোনার কৌটায় ভোমরার মত লুকিয়ে রাখা আছে সে সবও তার তখন জানা হয়েছে, সে-সব প্রত্যক্ষভাবে না দেখলেও শুনেছে।

শুধু তাই বা কেন ?

পনের যোল বছরে সে যখন ক্লাস টেনে উঠেছে যখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে এবং নিজের দেহের পরিবর্তনে অপরূপত্বে এবং কোমল মাধুর্যে নিজেই নিজের প্রেমে পড়েছে, তখন পথেঘাটে কত অপরিচিত তরুণকে তার ভাল লেগেছে অপাঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে— সে কথা তো সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভাসা জলের

মত সে এসেছে চলে গেছে—এইমাত্র। জীবনের মোড়কে সে ফেরাতে পারে নি। সিনেমাতে নায়কদের এবং তারা ছাড়া নায়িকাদের প্রেমই যেন তখন গাঢ়তর ছিল। স্কুলে ইতিহাস-দিদিমণির মুখের দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। বান্ধবীদের বাড়ী গিয়ে তাদের দাদাদের দেখে লজ্জিত হত—আবার সুযোগমত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত।

এ-সবই সত্যি। এতটুকু সে অস্বীকার করছে না। তবু সে বলবে যে না—এতদিন পর্যন্ত তার জীবনে কৈশোরের ফসল উঠে যৌবনের বীজ উপ্ত হয়নি। ভূমি প্রস্তুতই ছিল, হয় তো বা বীজও ছড়ানো হয়েই ছিল, তবুও বলবে যে বীজ তখনও উপ্ত হয়নি।

৪৮।৪৯।৫০ তিনটে বছর চলে গেল। সে-দেহে বাড়ল—দেহ ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে উঠল, চুলগুলি অকস্মাৎ যেন রাশি রাশি হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, সে অনেক বই পড়লে,—লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমায় ছবি দেখলে—তারপর পরীক্ষা দিলে—ম্যাট্রিক পাশ করলে। রেজাল্ট বের হল। সে সেদিন ছুটতে গিয়ে সঙ্কুচিত হল। স্বচ্ছন্দে লজ্জার ধার না-ধেরে সে ছুটতে যেন পারলে না, মুখখানা হেঁট হয়ে পড়ল আপনা থেকে। তবুও সে ছুটল, ছুটে সারা দেহকে আন্দোলিত করে আনন্দকে প্রকাশ না করে সে পারলে না। অল্প অল্প দৌড়ের ভঙ্গিতে—ছুটে ছুটে সে প্রণাম করে করে ফিরলে। তারপর কলেজে ভর্তি হল।

এবার ট্রামে বাসে যাওয়া আসা। মেয়ে পুরুষের ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে স্থান করে নেওয়া। এর মধ্যে বর্বরতা আছে, কুৎসিতপনা আছে আবার সে সব কিছুকে হার মানিয়ে নিজের ঠাঁই করে নেওয়াও আছে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর কলেজ।

বৃহত্তর জীবন জগৎ। সেখানে জোর করে জায়গা করে নিতে হয়। মেয়ে বলে কেউ সহজে সেখানে স্থান দেয় না। বুকের ভিতর যেন যৌবনের বীজ ফাটছে। অন্যদিকে মনের উপর একটা ভার বোঝা চাপছে।

ভবিষ্যতের কল্পনার ভার বোঝা। তার মধ্যে আদর্শ আছে আবার সাধ আছে আহ্লাদ আছে। আরও অনেক কিছু আছে।

কলেজের সিঁড়ির পাশে দেওয়ালে অসংখ্য পোষ্টার। ইউনিয়নের ইলেকশনের যুদ্ধে মতবাদের অজস্রতা। আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে অশ্লীল কথা। মেয়েরাই লিখত। ওই কথাগুলোকে খুঁজে খুঁজে ফিরত তার দু চোখের দৃষ্টি। শুধু তার কেন? সব মেয়ের। নতুন মেয়েদের চোখ যেন বেশী বেশী খুঁজত।

হঠাৎ একদিন যৌবন যেন জাগল। এবং বিচিত্রভাবে ওই জ্যোতিপ্রসাদের সঙ্গেই সেই 'লগ্নের' মত আশ্চর্য ক্ষণটি দেখা হয়ে গেল।

* *

*

সেদিন রাত্রে দাদা সৌরীন বাড়ী ফিরল না। এক সময় রাত্রি তখন অনেক; মা তাকে ডাকলে—গোপা! গোপা!—গোপা সে সময় স্বপ্ন দেখছিল। আজও তার স্পষ্ট মনে আছে সে স্বপ্ন দেখছিল। কি স্বপ্ন দেখছিল—তাও মনে আছে। তাদের মামার বাড়ীর সম্পর্কের বিমল সেন বিলেত গেছে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে; তার মা তাদের বাড়ী গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে গোপার বিয়ের কথা বলে এসেছিলেন সাহস করে। সে স্বপ্ন দেখছিল—সেই বিয়ের কথা হচ্ছে। সে পাশের-ঘরে দোরের পাশে আড়াল দিয়ে কথাগুলি শুনছে। বুকখানা স্বপ্নের মধ্যে ঢিব ঢিব করছিল তার।

৪ এরই মধ্যে মনে হল—ও ঘর থেকে—কথা বলতে বলতেই মা তাকে ডাকছে—গোপা! গোপা!

স্বপ্নের মধ্যে এই শিল্প কুশলতাটুকু বিচিত্রভাবে আছে। বাস্তবকেও সে স্বপ্নের মধ্যে খাপিয়ে নেয়। ডাকটা যখন ঘুমের স্তরকে ভেদ করে চেতনাকে নাড়া দিল তখনও স্বপ্ন রচনা করছে যে-মন সে-মন এটাকে, ওই ঘরে বসে মা ডাকছে,—এইভাবে খাপিয়ে নিয়েছিল।

তারপর একসময় পূর্ণ চেতনায় জেগে উঠে সাড়া দিলে—মা!

মা বললে—একবার ওঠ তো।

উঠে বসল সে।—কি মা?

—সৌরীন তো এখনও ফিরল না রে। একটা বাজে যে।

—দাদা আসেনি?

—না।

—তা হলে ফিরবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। একে তো সকালে ফেরা তার অভ্যেস নেই। তার উপর আজ আবার তার কোথায় জানি নেমন্তন্ন আছে। বেশ সেজেগুজে বেরিয়ে গেছে। সে একেবারে স্নো সেন্ট মেখে।

—কই আমাকে তো কিছু বলে নি!

—দেখা হয়নি বলেনি।

মা চুপ করে রইল।

গোপা বলেছিল—শোও। আসবেখন। তোমার ছেলে সৌরীন ছেলেটি সোজা ছেলে নয়; সেই অনেকের জন্যে ভাবে; তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

বলে সে আবার শুয়ে পড়েছিল এবং সেই অসমাপ্ত স্বপ্নটিকে কল্পনায় জাগ্রত স্বপ্নে রূপ দেবার জন্য একাগ্র হয়ে চোখ বন্ধ করেছিল।

মা ডাকছিল—গোপা! গোপা!

সে জিভ কেটে পা টিপে টিপে পিছিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে উত্তর দিয়েছিল—যাই মা।

তারপর আঁচলে মুখখানা মুছে নিয়ে এঘরে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—ডাকছ?

—এই-এই গোপা। আজ ঠিক চিনতে পারবেন না। বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রণাম কর—

এরই মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—কিন্তু স্বপ্নটা আর দেখেনি।

আবার মা ডাকলে—গোপা! গোপা!

বিরক্তিভরেই গোপা উঠে বসে বলেছিল—কি হল আবার?

—সৌরীন তো এল না এখনও। তিনটে বাজল যে?

—তা হলে?

—সেই তো ভাবছি।

একটু ক্ষণ ভেবে নিয়ে সে বললে—এত ভাবছ কেন? হয়তো নেমন্তন্ন বাড়ী গিয়ে আটকে গেছে। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে, বেশ খানিকটা দূর পথ—আটকে গেছে। হয়তো তাদের বাড়ীতেই আছে কিংবা কোন বন্ধুটন্ধুর বাড়ীতে রাত্রিটা থাকবে—আসবে কাল সকালে।

—কি জানি! আমার যেন কেমন—

—কি? কেমন আবার কি?

—ভাল লাগছে না।

তারপর আপন মনেই বকতে সুরু করেছিল—আমার যেমন কপাল!

একটু চুপ করে থেকে আবার একটা টুকরো কথা সেই স্তব্ধ রাত্রে মায়ের বুক থেকে বেরিয়ে এসেছিল—নীপার ওই হল। উনি—।

থেমে গেল মা। শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল অন্ধকারের মধ্যে। আগে হলে হয় তো মা কাঁদত। এখন আর কাঁদে না। পুরনো ক্ষতের উপর শক্ত হয়ে মাংস জমার মত যেন কড়া পড়েছে। কান্না এখন আর আসে না।

আবার একটু পর, তন্দ্রা তখন খানিকটা যেন গরম দুধের উপর পাতলা সরের মত জমে এসেছে, ছোট্ট একটি ঢেলার মত চাল থেকে কি ছাদ থেকে খসে পড়া কিছুর মত টুপ করে পড়ল তার সেই তন্দ্রার উপর এবং তন্দ্রার আস্তরণটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিলে।

যা হয়েছিল—তা হয়েছিল—সয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে নতুন করে ঘর পাতলাম। সৌরীন পড়বে—পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ হবে—কত আশা যে করেছিলাম—গোপার বিয়ে দেব, সৌরীনের বিয়ে দেব—

আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মা।

এবার কান্না পেয়েছিল গোপার।

॥ চার ॥

মা এরকম করে বিলাপ করে কাঁদত মধ্যে-মাঝে। প্রথমটা ঘন ঘন, তারপর নেহাত কম হলেও সপ্তাহে একদিন দুদিন, ক্রমে সেও কমে এসে মাসে দুদিন তিনদিনে দাঁড়িয়েছিল।

নিদারুণ আঘাত এবং প্রতিকারহীন দুঃখের মধ্যে এসে সংসার পেতেছিল নতুন করে। নরেশ গুপ্তের অতি যত্নে গড়ে তোলা সংসারের রীতি নীতি চাল-চলন ধারা-ধরন সব কিছুর বিপরীত বলতে পারা যায়—সে সমস্তকে আগাগোড়া ভুল স্বীকার করে নিয়ে সংসার পেতেছিল।

দুখানা ঘরের সংসার। পুরনো আমলের বাড়ী। আসবাবপত্র নেই; খাট না—চেয়ার টেবিল না—টিপয় না, সাদামাটা সস্তা জারুল কাঠের তক্তপোষ দিয়ে সংসার পাতা হয়েছিল প্রথম।

নরেশবাবুর পরিত্যক্ত কয়েক হাজার টাকা মাত্র সম্বল। তাতে সৌরীন তখন সবে আই-এ পড়ছে, গোপা পড়ছে স্কুলে। ওদের পড়াতে হবে—তারপর গোপার বিয়ে আছে।

১৯৪৭।৪৮ সাল—তখনও মেয়ের জীবনে বিয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। ভাবতে গেলে তখনও দৈববাণীর মত কোন বাণী মানস লোকে ধ্বনিত—চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হোক বা না হোক—মেয়ের নারীত্বের লাঞ্ছনার আর শেষ থাকবে না।

গোপা তখন চৌদ্দ বছরের—তখন থেকে গোপা বিয়ের কথা ভাবত। কল্পনা করত। এ কল্পনা সে পার্ক সার্কাসে থাকতে করত

মা। মধ্যে মধ্যে পাড়ায় কোন বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে হলে নেমন্তন্নের জন্যে মন লালায়িত হত।

সেটা অবশ্যই পোলাও লুচি চপ কাটলেটের জন্য ঠিক নয়। একটা কারণ ছিল খুব ভালভাবে সাজবার সুযোগ পাবে। আর একটা কারণ ওই বরটিকে দেখবে। দেখে কি হত বা হতে পারতো এ ঠিক গোপা বুঝত না—আজও বোঝে না—তবে এটা ঠিক যে ওই বরটি যদি তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতো তবে তার খুব ভাল লাগত।

থাক।

মা এইভাবে থাক বলেই এসব কল্পনায় ছেদ টেনে দিত। মনে পড়িয়ে দিত—তার বিয়ে হওয়া এত সহজ নয়। তার বাবা খুন হয়েছে। তাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই। তার দিদি—। সত্য কথাটা বলা দূরের কথা ভাবতেও পারত না। ভাবত—ওসমানই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আজ তারা নিতান্ত গরীব। কোন রকমে সংসার চালিয়ে চলেছেন তার মা।

সে মানত। ।কন্তু তার দাদা মানত না। জীবনের এই পরিবর্তনটাকে সহজে স্বীকার করতে সৌরীন পারে নি। দুই বোনের মধ্যে একমাত্র ছেলে বলে তার আদর ছিল বেশী এবং তার দিক থেকে আবদারও ছিল তার থেকেও বেশী। নরেশ গুপ্ত তাঁর জীবনের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলতে, সমাজ ও মানুষের কাছে তুলে ধরতে সচেতনভাবে সচেষ্ট ছিলেন বলে ছেলে মেয়ের পোষাক-পরিচ্ছদে, খেলায়-ধূলায়, পড়ায়-শোনায় খরচ কিছু বেশীই করতেন। এই নিদারুণ পরিবর্তনের পর গোপা হয় তো মেয়ে বলেই কোনরকমে এটাকে সংযত করতে পেরেছিল, কিন্তু সৌরীন পারেনি।

সে আবৃত্তি করত ভাল, খেলাধূলায় ছিল ভাল এবং স্থানীয় যে কোন আন্দোলনে বা কাজকর্মে একটি অনায়াস সহজ ছন্দে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটি অংশ গ্রহণ করত। এই নতুন পাড়ায় এসে সে সেই পারঙ্গমতার জোরেই স্থানীয় ক্লাবটির ব্যাণ্ড ও ভলেণ্টিয়ার পার্টির ও-সি বা অফিসার কমাণ্ডিং হতে পেরেছিল। এবং তারপর অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে সেদিন—১৯৫১ সালের ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত এ পাড়ায় তরুণ দলের অগ্রণীই হয়ে ওঠেনি মোটামুটি উত্তর কলকাতার একজন নামকরা ইয়ংম্যান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনে পলিটিকসটাকে বেশ ধাতস্থ করে নিতে পারেনি—পারলে একজন লীডার হয়ে যেত। তবে পলিটিকস বাদ দিয়ে খেলায়-ধূলায় অভিনয়ে-আবৃত্তিতে সাহিত্যের সমারোহে উত্তর কলকাতায় সে নিজেকেই নিজে রইস আদমী বলে অভিহিত করত। ব্যাডমিণ্টনে ওস্তাদ খেলোয়াড় ছিল, ফুটবল মন্দ খেলত না—এ ডিভিসন লীগেও বছর দুই খেলেছিল, উত্তর কলকাতা রবীন্দ্র জয়ন্তীর ও নজরুল জয়ন্তীর সে ছিল প্রধান উদ্যোক্তা। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় জিতে-আনা কাপের সারি সাজানো রয়েছে ভাঙা কাচের আলমারিটায়। লেখাপড়াতেই গণ্ডগোল। তাও অবশ্য খুব বেশী নয়। গত বছর বি-এটা পাশ করেছে পাস কোর্সে; এখন ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে, নামটা আছে, অন্যদিকে চাকরীর চেষ্টা করছে; আর একদিকে তার প্রতিষ্ঠার জগৎ—তাই নিয়ে সে মত্ত হয়ে রয়েছে।

মায়ের দুঃখ সে ঠিক বোঝে না—মায়ের এই দুঃখ। মায়ের দুঃখ তাঁর অভিযোগ—নরেশ গুপ্তের ছেলে নরেশ গুপ্তের মত হল না।

না—তার সেই সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ সুন্দর মন ও চরিত্র,—না তার মত সেই সম্মানজনক একটি চাকরী, না—তাঁর মত মান সম্মান কিছুই হল না।

গোপা মধ্যে মধ্যে বলত,—মা দাদার সেই বয়স হোক—এখন থেকে এমন কথা বলছ কেন?

মা বলত—গাছ কেমন হবে সে চারার বাড়ের রকম দেখলেই বোঝা যায়, নদী যখন বের হয় তখন সেটা নদী থাকে না—তখন সেটা একটা নালা। তবে সেই নালায় জলের তোড় দেখে আর যে অঞ্চলে মাটির ঢাল—সেই অঞ্চল দেখে দিব্যি বোঝা যায় নদীটা কত বড় হবে। গাঙে পড়বে না বিলে খালে গিয়ে মরবে।

তারপর একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কপালে হাত দিয়ে বলতো—আমার কপাল।

সৌরীন এসব শুনেও কানে তুলত না। আপনার কাজকর্ম—অর্থাৎ যা-নিয়ে সে দিন কাটায় তাই নিয়ে এমনি মত্ত থাকত যে, তাকে প্রকৃষ্টরূপে মত্ত অর্থাৎ প্রমত্ত ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এবং যে মানুষ প্রমত্ত হয়ে নাচে তার নাচের তাল যেমন ভূমিকম্পেও কাটে না বা বন্ধ হয় না তেমনিভাবে মায়ের দীর্ঘনিশ্বাস, সংসারের অবস্থার বিশীর্ণতা কোনটাই সৌরীনের গতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারত না।

সম্প্রতি কিছুদিন, এই মাস দুয়েক থেকে সৌরীন যেন বড় বেশী ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে: ঘরদোর মা বোন সবকিছুকে চোখের সামনে রেখেও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতে বসেছে। দু-তিনদিন ধরে একটা ঝগড়াও চলছিল বাড়ীতে।

অর্থাৎ মা এবং সৌরীনের মধ্যে।

গোপা তার মধ্যে পড়ে দুদিক থেকে মার খাচ্ছে এবং মার খাচ্ছে সে মুখ বুজে। মুখ খুলবার তার উপায় নেই। কারণ পৈত্রিক টাকা।

নরেশবাবু যে টাকা রেখে গিছলেন—তার পরিমাণ বেশী ছিল

না ; হাজার দশেক। তার সঙ্গে নিজেদের গহনা যে-কখানা গোপার এবং তার মায়ের গায়ে ছিল—সেইসব বিক্রী টিক্রী করে মোট দাঁড় করানো হয়েছিল বার হাজারে। টাকাটার মধ্যে ছ হাজার অর্থাৎ অর্ধেক ফিকসড ডিপোজিটে আবদ্ধ রেখে—বাকীটা পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে রেখে নতুন সংসারের পত্তন হয়েছিল। এর ওপর দুটি বাড়ীতে দুবেলা দুটি করে চারটি ছোট ছেলে পড়িয়ে মা পেত তিরিশ টাকা আর সৌরীন নানান রকমের কর্ম—সে রবীন্দ্র জয়ন্তী থেকে সার্বজনীন পূজার্চনা পর্যন্ত অনুষ্ঠানে পাণ্ডাগিরি করে মাসে আরও তিরিশটে টাকার সংস্থান করে দিত। এছাড়া তার নিজের সিগারেট ট্রাম বাস জামা কাপড় এসবগুলোও চালিয়ে নিত। এ উপার্জনটা ক্রমশ ক্রমশ বেড়েছে, কমেনি। ম্যাট্রিক পাশ করে গোপাও দুটো ছোট ছেলে পড়ায়। কিন্তু উপার্জন বাড়া সত্ত্বেও অকস্মাৎ দেখা গেছে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকাটা কিছুদিনের মধ্যে দ্রুত ফুরিয়ে এসেছে।

টাকা বের করত—সৌরীন।

মাস কয়েকের মধ্যে টাকা বেশী বেশী বের করেছে সে। এটা ধরা পড়েছে তিনচারদিন আগে।

মা আগুন হয়ে উঠেছিল—কি করলি টাকা ?

সৌরীন তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—কোন উত্তর দেয়নি।

মা—উত্তপ্ততর হয়ে বলেছিল—সৌ-রী-ন !

সৌরীন আবার একবার তাকিয়েছিল মায়ের মুখের দিকে। এবং আবারও মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু গোপা দেখেছিল গতবার সৌরীনের যে মুখখানা সাদা দেখিয়েছিল এবার সে মুখখানা তার টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে। যে-রক্ত সরে গিয়েছিল সে-রক্ত ফিরে এসেছে।

বুঝতে পেরেছিল—সৌরীনের মনে কি হচ্ছে।

তার মনেও তো এমনি যুদ্ধ চলত। কিছুদিন আগে কলেজের ফাংশানে বেশী একটু মেতে ওঠার জন্যে তাকে মা এমনি—কি এর থেকে চড়া বকুনী দিয়েছিল। নিষ্ঠুর অপবাদ দিয়ে বকুনী দিয়েছিল মা।

মা ট্রামে আসবার পথে তাকে দেখেছিল একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে। সেই কারণে একটা অপবাদ দিয়ে তিরস্কার করেছিল।

মা বলেছিল—বল—ও—কে?

সে সত্য বলেছিল—সে চেনে না। বলেছিল—চিনিনে আমি।

সত্যই সে তাকে চিনত না। ছেলেটা তাকে দেখে তার পিছু নিয়েছিল। কলেজের সামনে রাস্তায় কোথাও দাঁড়িয়ে থাকত। সে বের হলেই বেরিয়ে পড়ত এবং পিছন-পিছন আসত। ট্রামে উঠলে ট্রামে উঠত, বাসে উঠলে বাসেই উঠত সে। এবং এই পাড়ার মোড় পর্যন্ত এসে চলে যেত। ছেলেটা লাজুক—ছেলেটা ক্যাংলা—ছেলেটা একটা ভীতু ছেলে—কোল কুঁজো একটা ছেলে। প্রথম কিছুদিন ছেলেটাকে একটু নাচিয়েছিল। বেশ লেগেছিল। একটা বাঁদরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নাচানোর মধ্যে একট খেলা আছে। দু চারদিন বেশ লাগে। তাই দু চারদিন মন্দ লাগেনি। তারপর উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। সে-দিন যেতে যেতে পথে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে কয়েকটা কথা তাকে সে বলেছিল—কি চাই আপনার? আমার পেছন নেন কেন?

কণ্ঠস্বরে ছেলেটা কেমন হয়ে গিয়েছিল—বলেছিল—এঁ্যা?

সে বলেছিল—তুমি একটি শূকরের বাচ্চা।

ছেলেটার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। তবু বলতে চেষ্টা

করেছিল—"আমাকে"—হয়তো বলতে চেয়েছিল—আমাকে কেন গাল দিচ্ছেন? আপনি ডাকলেন যে চোখ মেরে?

কিন্তু তার আগেই গোপা বলেছিল—তোমাকে কানে ধরে আমার পায়ের চটি খুলে গালে পটাপট করে মারব?

এবার ছেলেটা বোবার মত দাঁড়িয়েছিল।

গোপা বলেছিল—তোমার বোন নেই বাড়ীতে? মা নেই? মাসী নেই? উল্লুক শূয়ার কুকুর—!

এমন সব খটখটে কথা খুব মৃদুস্বরে বলেছিল কিন্তু। কারণ এ নিয়ে গোলমাল বাধাতে সে চায়নি।

তার মা এই মৃদুস্বরে কঠোর এবং কঠিনতম কথা বলার সত্যটি বুঝতে পারেনি—বা চায়নি। সে তিরস্কার করেছিল।

মা বলেছিল—ও—কে? বল!

সে বলেছিল—জানি নে। চিনি নে।

—মিথ্যে বলছিস।

—না।

সে-সবই মনে পড়েছিল সেদিন তার সেই মুহূর্তে।

মনে পড়েছিল মায়ের প্রথম প্রশ্নেই তার মুখের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল এবং মা তারপর যত বেশী চীৎকার করেছিল তত বেশী রক্ত এসে তাদের মুখে জমা হয়েছিল। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল —সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশে বাজতে সুরু করেছিল বিচিত্র ধরনের শব্দ—অনেকটা নিস্তব্ধ রাত্রে ঝিঁঝিঁর ডাকের মত।

সৌরীনের সাদা মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল সৌরীনের মনের ঝড়ের ইসারা। ঝড় উঠেছে।

কিন্তু সে ঝড় তার জীবনেও ওঠে। মেয়ে ছেলে, এযুগের মেয়েরা অনেক স্বাধীন একথা ঠিক, তবুও মেয়েরা মেয়ে। কোথায় বুকের

মধ্যে আছে একটা ভয়, কোথায় আছে একটা কান্না-পাওয়া নরম-নরম মনের খানিকটা অংশ, যেটা একটুতেই চোরাবালির মত সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে—শিক্ষা দীক্ষা সাহস-সংকল্প সব কিছুকে নিজে নিজেই গিলে বসে থাকে। সৌরীন পুরুষ। তার উপর সে দুর্দান্ত। গোপা সৌরীনের মুখ দেখে ভয় পেয়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

সৌরীনের মুখ দেখে শঙ্কিত হয়ে সে মাকে বারণ করতে চেয়েছিল—থাক এসব কথা থাক। এমন ক'রে বলো না মা। কিন্তু মুখে বলতে পারেনি; মুখে শুধু শঙ্কিত স্বরে বলেছিল—মা।

মা গ্রাহ্য করেনি—সে সৌরীনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—কথার জবাব দে সৌরীন। না হ'লে আমি পুলিশে খবর দেব।

এবার সৌরীন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুখ নামায়নি। বলেছিল—আমি আর মাইনর নই। আমি এখন সাবালক হয়েছি। ও টাকা আমার বাবার টাকা। আমি মাইনর ছিলাম বলে টাকার দেখাশুনা তুমি করেছ। এখন ও টাকা আমার। দিতে পার তুমি পুলিশে খবর। আমি তোমার সই করা উইথড্রয়াল ফর্মেই টাকা বের করেছি। জাল করিনি।

বলেই সে আর দাঁড়ায়নি—হন হন ক'রে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। মা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

কাণ্ডটা ওখানেই থেমে ছিল না। ছেদও পড়েনি, কোনও আপোষও হয়নি। কাঁটাপুকুরের কবিরাজ জেঠামশাই আজও বেঁচে আছেন, তাঁর কাছ পর্যন্ত গিয়েও মা কিছু করতে পারেনি।

কবিরাজ গুপ্তমশাই বেশ প্রতিপত্তিশালী মানুষ, এখানে কিন্তু সে প্রতিপত্তি সৌরীনের মত ছেলেকে কাবু করতে পারে না।

মা অনেকটা যেন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। গোপার লজ্জার শেষ ছিল না। কারণ তার মা তাঁর সকল ক্ষোভের কেন্দ্রে কারণ হিসেবে তাকেই দাঁড় করিয়ে

রেখেছেন। বারবার বলেছেন এবং ওই এক কথা ধরে রেখেছেন — নরেশ গুপ্তের তুই একটি ছেলে নস। তার ওই মেয়েও আছে। গোপা। কুমারী মেয়ে। তোর সঙ্গে তার সমান অংশ। আমার অংশের কথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমি খেটে খাচ্ছি—যখন না পারব তখন ভিক্ষে করে খাব। আমি সমানে খেটে আসছি আজ চার বছর ; তোদের কিছু খাইনি। ভবিষ্যতেও খাব না। কিন্তু নরেশ গুপ্তের মেয়ে ? তার কি হবে ? তার বিয়ে দিতে হবে না ? তার বিয়ে আগে না তোর ভাগ পাওয়া আগে ?

সৌরীন শেষ বলেছিল—বেশ ফিকস্ড ডিপোজিটের ছ হাজার টাকা মেচিওর হয়ে ব্যাঙ্কে রয়েছে। সে তোমার নামেই আছে। নাওগে তোমার সেই টাকা। আমাকে আর বিরক্ত কর না। আমি চলে যাব। কারণ ঠিক পোষাবে না আমার তোমাদের সঙ্গে। একটা চাকরী—যে কোন চাকরী পেলেই চলে যাব আমি।

দোহাই তোমার মা। দোহাই তোমাকে। এর থেকে বেশী কিছু আমি করতে পারি নে। কয়েকটা দিন সবুর কর তুমি। কয়েকটা দিন। মায়ের জেদ ভীষণ।

মা ছেলের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন। ওই যে দাদা বলেছিল আমি চলে যাব। তোমাদের সঙ্গে আমার পোষাবে না ; এই কথা কয়টার জন্য।

দাদা সৌরীনও কম না। কয়েকবার কথা বলে উত্তর না পেয়ে সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ও, কথা বলবে না বুঝি আমার সঙ্গে ?

মা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

সৌরীন বলেছিল, ভাল। এই একটি ছোট্ট কথা বলেই সেও কথা শেষ করেছিল।

কথা বলেছিল কাল। তার আগের দিন একটা মারচেন্ট আপিসে চাকরীর জন্য বিকেলে ফুটবল খেলে এল। মারচেন্ট আপিসের ফুটবল টীম আছে—খেলোয়াড় চাকরে নেবে। সৌরীন গত বছরে এ ডিভিসনে খেলেছিল—নাম আছে, তাকে ডেকেছিল কর্তৃপক্ষ। ভালই খেলে এসেছে, ফরওয়ার্ডে খেলে দুটো গোল দিয়েছে। চাকরী তার হবে। সেই চাকরী নিয়ে কাল কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল দাদা।

সকালে এসে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মা সবে টিউশানি সেরে বাড়ী এসে ঢুকেছে। বাজারের থলিটা নামিয়ে দিয়ে কাপড় ছাড়তে যাবে এই সময় এসে দাঁড়িয়েছিল দাদা।

একটু অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

মা ভোরে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ছেলে পড়াতে যায়; গোপা চা ক'রে দেয়। মা চলে যায়, গোপা পড়তে বসে; ওদিকে ঠিকে ঝি কাজকর্ম করে। বাসন মাজা, রান্নাঘর পরিষ্কার, ঘরদোর পরিষ্কার করে উনোনে আঁচ দিয়ে বাটনায় বসে। গোপা এর মধ্যে ঘণ্টা-খানেক পড়ে নিয়ে উঠে পড়ে। রান্না চড়াতে আসে। ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে আবার গিয়ে পড়ে। ওদিকে দাদা উঠলে কেরোসিন ষ্টোভে চা করে নিজেও একটু খায়। দাদাকে বোঝায়।—কেনরে দাদা কেন এমন ক'রে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস বলতো? কেন?

সৌরীন আগে এসব নিয়ে আলোচনা করত, কথা বলত; কিন্তু আজকাল এই কয়েক মাস ওই টাকার ব্যাপারটার 'পর থেকে যেন কেমন হয়ে গেছে। ভাল ক'রে কথাবার্তা বলে না। বলতে চায় না।

কয়েকবার সে বলেছে—দাদা—।

দাদা উত্তর দেয়নি। কেমন যেন হয়ে গেছে। অহরহই কেমন অন্যমনস্ক। সে আবার ডেকেছে—এই দাদা। শুনছিস?

—কি ?

—কি ভাবিস বল তো ? কথা কানে যায় না ?

উত্তর দেয়নি দাদা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে থেকেছে। সে আবার বলেছে—এই দাদা !

—আমি বড় অশান্তিতে রয়েছি রে !

—কিসের অশান্তি তোর ? ব্যাপারটা কি ?

—ব্যাপার আবার কি ? দেখছিস তো—মায়ের—। থাক গোপা এ নিয়ে আলোচনা ঠিক আমি করতে চাইনে।

থাক—এসব পুরনো দৈনন্দিনের কথা। এ কলহ তুচ্ছ খুটি-নাটির সামিল না-হলেও, এ অশান্তির মধ্যেই সংসার চলছিল তাদের। হঠাৎ পরশু ধোঁয়ানো জীবন দপ ক'রে জ্বলে উঠল। সে দিন মা এসে বাজারের থলিটা সবে নামিয়েচে, টিউশন সেরে ফিরবার পথে মা বাজারে ঢুকে বাজার ক'রে আনে। কিছু আলু কিছু অন্য সব্জী তার সঙ্গে ছেলে মেয়ের জন্য মাছ।

তখনকার দিনে—।

১৯৫১ সালের দিন ; তখন আজকের মত বাজারের অবস্থা হয় নি। থাক—বাজার—বাজারদরের কথা।

বাজার দরের পীড়নে জীবনের সমস্ত রস নিংড়ে টেনে চুষে নিয়েছে —জীবনের পল্লব-পুষ্প শুকিয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে, তবুও জীবন ফুল ফোটাতে চায়, তাতে কুঁড়ি ধরে আজও। সে থাক। সে থাক।

১৯৫১ সালে সেদিন মা এসে সবে বাজারের থলিটা নামিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই দাদা এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। বলেছিল—তুমি কথা বন্ধ করেছ বলেই আমি কথা বন্ধ করেছি। কিন্তু আজ আমার প্রয়োজন জরুরী প্রয়োজন। এক কথা না বললেই নয়। বলতেই হবে আমাকে। কারণ আমার প্রায় জীবন-মরণ সমস্যা।

মা কথা বলেনি—শুধু মুখের দিকে তাকিয়েছিল ছেলের।

সৌরীন বলেছিল—আমার পাঁচশো টাকার দরকার। চাকরীটা আমাকে পেতে হবে। ঘুষ দিতে হবে।

এবার মা বলেছিল—ও টাকা গোপার বিয়ের জন্যে রেখেছি।

—পাঁচশো টাকা কম হলে গোপার বিয়ে আটকে যাবে না। আর তখন আমি টাকাটা যেখান থেকে পাই পূরণ করে দেব।

মা মাথা নেড়ে বলেছিল—না সে আমি দেব না।

—দেবে না?

—না।

—দিতে তোমাকে হবে মা। এই তোমাকে শেষবার চাচ্ছি।

—না।

—না?

—না।

—আচ্ছা। বলে উঠে চলে গিছল সৌরীন। সারা দিনটা আর ফেরে নি। ফিরেছিল রাত্রে। রাত্রি তখন অনেকটা। আবার আজ ভোরে উঠে বেরিয়ে ফিরেছিল ছুটোর সময়। তারপর কামিয়ে স্নান করে বেশ সেজেগুজেই বেরিয়ে গেল—বলে গেল—রাত্রে আমার নিমন্ত্রণ আছে।

আর কোন কথা না।

এখন এই রাত্রি একটার সময় মা তাকে ভাবছে। —গোপা! সৌরীন তো এখনও এল না রে!

গোপা বললে—সে আসবে। কেন ডাকছ?

বলতে বলতেই গোপা ঘুমিয়ে পড়ল।

এরই মধ্যে স্বপ্ন দেখলে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

আবার ডাকলে মা। সে বিরক্ত হল। মা বললে তিনটে বাজছে।

তা বাজুক না। সৌরীন সেন নিশ্চয় আসবে। কোথাও আটকে গিয়ে থাকবে।

ঘুম তার আর এরপর আসেনি। সে চোখ বুজে শুয়ে তার সেই স্বপ্নটি যেটি তার বিয়ের স্বপ্ন এবং যেটি মাঝখানে ভেঙে গেছে—সেইটিকেই আধ ঘুম ঘুমের মধ্যে কল্পনা ক'রে সম্পূর্ণ করতে লাগল।

মা তার মধ্যেই আক্ষেপ করছিল—নীপার ওই হল। উনি—।

অর্থাৎ নরেশবাবু।

আবার মা বললে—সৌরীন গোপা'র বিয়ে দেব—।

মায়ের সে কণ্ঠস্বর এবং বুক-ভাঙা বিলাপের কথাগুলি শুনে তার কান্না পেয়েচিল।

আর ভাঙা স্বপ্নকে জেগে শুয়ে জোড়া দিতে মন চায়নি—সে উঠে বসেছিল।

চুপচাপ এসে বসেছিল মায়ের পাশে।

মা বলেছিল—উঠলি কেন? শুয়ে থাক না। কি করব—কেন জানিনে আমার ঘুম ঠিক আসছে না। কিছুতেই এল না। আমি হয়ত বেশী জেদ করেছিলাম, না?

সে চুপ করে থেকেছিল।

পাশের বড় বাড়ীটা থেকে ক্লক ঘড়ির আওয়াজ ভেসে এসেছিল ঢং ঢং ঢং ঢং।

চারটে বাজছে। ভোর-ভোর ঘোর লেগেছে রাত্রের আকাশে।

রাত্রির আকাশের ঘষা কাচের মত চেহারা হয়েছে। কলকাতা শহরও এত স্তব্ধ এখন যে, পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে।

ওরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

পাঁচটা বাজল। বেশ সকাল হয়েছে। মা উঠল। উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল। সে ষ্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে।

বাইরের দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। ঠিকে ঝি যমুনার মা দাঁড়িয়ে, তার পিছনে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বাড়ীর দিকেই তাকিয়ে।

যমুনার মা বললে—তোমাকে ডাকছে।

—আমাকে?

সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোতিপ্রসাদ।

জ্যোতিপ্রসাদের সর্বাঙ্গে যৌবনের প্রকাশ—আজ যেন বড় স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ল তার। এই ভোর বেলা তাকে ডাকছে!

যমুনার মা বললে—ওদের বাড়ীতে আগে কাজ করতাম তো। তা বললে, যমুনার মা একটু চুপি চুপি ডেকে দেবা তোমাদের গোপাকে। কেমন? কি কতা আছে।

রাঙা হয়ে উঠল গোপা। বুকের ভিতরটা ধড় ফড় ক'রে বারকয়েক লাফ দিয়ে উঠল। জ্যোতিপ্রসাদও যেন রাঙা হয়ে উঠেছে।

এই নির্জন ভোরবেলাটাই যেন তাদের দুজনকে এমন করে রাঙিয়ে তুলেছে।

—গোপা!

গোপা উত্তর দিতে পারে নি। গলা তার শুকিয়ে গিয়েছিল।

—একটা কথা বলতে এসেছিলাম। কাল রাত্রে দুবার এসেছিলাম। কিন্তু ডাকতে সাহস পাইনি।

গোপার মনে পড়ছে—সেই মার্চের সময়ের কথা। কত ছোট ছোট চোখোচোখির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা—তারপর আর একটা। এবং সে সবগুলোর কত বিচিত্র মানে যে আজ মনে হচ্ছে তা ঠিক ধরবার মত মনের শক্তি নেই গোপার।

জ্যোতি বললে—সৌরীন দাদা কাল রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করলে। কনেকে তোমরা জানো। পার্ক সার্কাসের মণিকা বিশ্বাস। আমাকে সাক্ষী হতে বলেছিলেন সৌরীন দা। আমি সাক্ষী হয়েছি। বিয়ে ক'রে কাল রাত্রে ওরা পার্ক সার্কাসে আছে, আজ সকালের ট্রেনেই চলে যাচ্ছে কোম্পানীর ফ্যাকটরী—আসানসোলে।

মার্টিনে চাকরী পেয়েছে তো; আজই জয়েনিং ডেট। তোমার মাকে বলো।

গোপা সব শুনেও কেমন অভিভূতের মত জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে আরক্তিম হয়ে তাকিয়েছিল।

॥ ছয় ॥

সেই দিন সেই ভোরবেলা ওই খবরটার সূত্রের একটি প্রান্ত জ্যোতি এসে তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

সূত্রের অন্তরালে ভাগ্যবিধাতার মত কোন সূত্রধারকে একালে ঠিক মেনে নেওয়া যায় না, না-হলে গোপা ভাবত বা মনে মনে আজ বলত—যে সূত্রধার সেদিন সূত্রটির এক প্রান্ত জ্যোতির হাত এবং অন্য প্রান্তটি জ্যোতিপ্রসাদের হাত দিয়েই গোপাকে ধরিয়ে দিয়ে—সেই একান্ন সালের অকটোবর হ'তে এই সাতষট্টি সালের ১১ই মে—২৭শে বৈশাখ পর্যন্ত একটি গ্রন্থি রচনা করার খেলায় তাদের মত্ত ক'রে রেখেছিলেন তিনিই আজ সেই সূত্রটির মাঝখানে ছুরি চালিয়ে দু টুকরো ক'রে দিলেন। আর ছিন্ন সূত্রটির একপ্রান্ত ধ'রে জ্যোতি চলে গেল এক পথে এবং সে অর্থাৎ গোপা অপর প্রান্তটি ধ'রে মুহ্যমান হয়ে ভেঙে পড়েছে এই কতকালের পুরনো ঘরখানির মধ্যে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে চাইছে কিন্তু পারছে না। ১৯৫১ সালে যা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬৭ সালে তা শেষ হল।

ছেঁড়া সূতোর টুকরোটিকে সে ফেলে দিতেও পারছে না। এই সূতোটি নিয়ে তারা দুজনে কত ভাবেই না একটি অক্ষয়গ্রন্থি রচনা করতে চেষ্টা করেছে। ছোট্ট একটুখানি হাতের স্পর্শের টুকরো, অপাঙ্গে চাওয়া, এতটুকু ক্ষীণ হাসি, একটি ভ্রূভঙ্গি, ছোটখাটো কথা, টুকরো চিঠি, কত অপরাহ্ণ যাপন।—সব মনে পড়ছে।

সেইদিন সুরু হয়েছিল—১৯৫১ সালের অকটোবর মাস ভোরবেলা। জ্যোতি খবর দিতে এসেছিল—সৌরীনদা বিয়ে করেছে

কাল। রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে। পার্ক সার্কাসে মণিকা বিশ্বাস। খৃশ্চান মেয়ে। তাকে তো তোমরা চেন।

বিস্ময়ে আঘাতে হতবাক হয়ে গিয়েছিল গোপা।

দাদা এমনভাবে লুকিয়ে বিয়ে করেছে? তাকেও বলেনি? পার্ক সার্কাসের মণিকা তাদের সঙ্গে একবাড়ীতে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকত। হ্যাঁ। তাকে চেনে গোপা। জানে। তার সঙ্গেই মণিকা পড়ত। কিন্তু তাদের জানালে না? ও! এই জন্যেই তার টাকার দরকার হয়েছিল!

বুকখানা হঠাৎ যেন ধ্বক করে লাফিয়ে উঠেছিল।

দাদা—তাহলে—আলাদা হয়ে গেল? তাদের ছেড়ে চলে গেল?

মনে পড়ল দিদি নীপা এর থেকেও নিষ্ঠুর এবং রূঢ় ভঙ্গিতে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বাবা তাকে আটকাতে গিছল—বাবাকে তার জন্যে জীবন মাশুল দিতে হয়েছে। বাবাকে খুন হতে দেখেও দিদি ফেরেনি।

সেদিন সেই মুহূর্তে সে আশ্চর্য হয়েছিল—ছি-ছি করেছিল যত ছি-ছি করেছিল দিদিকে তত ছি-ছি করেছিল দাদাকে। না, সেদিন সেই ভোরে দাদাকেই ছি-ছি করেছিল বেশী। দিদি হয়তো—। হয়তো তার আগেই ওসমানকে আত্মদান করে বসেছিল। মেয়েদের দেহটাই মেয়েদের জীবনে সব থেকে বেশী আনুগত্য দাবী করে পুরুষের। কোন পুরুষকে একবার দেহ দিলে আর তা ফিরে নেওয়া, সংসারে সমাজে থেকে অন্তত যায় না। কিন্তু দাদা? দাদা একবার তাদের কথাও ভাবলে না? এই চার-পাঁচ বছর মা প্রাণপণ পরিশ্রম করে তাদের এমন করে বড় করে তুললে—।

বুকের ভিতরটায় একটা তুফানের মত ক্রুদ্ধ, বেদনার্ত ক্ষোভ যেন ফেটে পড়েছিল। মেঘের বুকে চমকানো যে বিদ্যুৎ বজ্র হয়ে মাটির দিকে নেমে আসে, যাতে প্রচণ্ড অসহনীয় দীপ্তিকে সব ঝলসে দেয় এবং প্রচণ্ড গর্জনে সব কাঁপিয়ে দেয়—ঠিক সেইভাবে সে ক্ষোভ পড়তে চেয়েছিল তার দাদার উপর।

এতবড় অকৃতজ্ঞ এতবড় স্বার্থপর—এতবড় নারীদেহ-লোলুপ কামার্ত। তার চোখে বোধহয় সেই দীপ্তির চকিত আভাস দেখতে পেয়েছিল জ্যোতি। সে ভয় পেয়েছিল। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলেছিল—মাকে ব'লো। আমি তাহলে যাই।

—না। বলে খপ ক'রে জ্যোতির হাত চেপে ধরেছিল গোপা।

—না। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমি পারব না। বিশ্বাস কর তুমি—আমরা অন্তত আমি এর কিছুই জানতাম না। উনি আমাকে ভালবাসতেন, ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন—এক সঙ্গে খেলেছি; আমাকে ব্যাডমিন্টন উনি হাতে ধরে শিখিয়েছেন। নিজের জুটী ক'রে নিয়েছিলেন। আমি জানতাম—মণিকা বিশ্বাসের সঙ্গে ওর ভাব আছে। কিন্তু—।

—আপনার কৈফিয়তে আমার দরকার নেই জ্যোতিবাবু—আমাকে আপনি হাওড়া ষ্টেশনে নিয়ে চলুন। আমার সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে। কোন্ ট্রেনে ওরা যাচ্ছে—আমাকে দেখিয়ে দেবেন। একবার আমি জিজ্ঞেস করব।

—আপনি যাবেন? কিন্তু কেন যাবেন? কি হবে?

—কিছু না। একবার জিজ্ঞাসা করব।

—কি হবে?

—জিজ্ঞাসা করাই হবে। জিজ্ঞাসা করব—মা-বাপ, ভাই-বোন, ঘর-সংসার, সমাজ-ধর্ম এসব থেকেও কি পুরুষের কাছে একটি মেয়ের

দামই বেশী ? এ পৃথিবীতে পুরুষের জীবনে এর থেকে বেশী দাম কিসের ?

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল জ্যোতি, কোন উত্তর দেয়নি।

গোপা ঘরের দোর থেকে নেমে এসে পথে দাঁড়িয়ে বলেছিল—চলুন। আমাকে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে। আপনি কিছু জানেন না তার প্রমাণটা দিতে হবে। দাঁড়ান —।

বলে সে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যমুনার মাকে হেঁকে বলেছিল—আমার চটী জোড়াটা দিয়ে যাও যমুনার মা, আর দেখ আমার বিছানায় বালিশের তলায় ব্যাগটা আছে। পাস টা। আর মাকে বলো আমি একটু বেরুচ্ছি। দাদা কাল বিয়ে করেছে। বলো —মণিকাকে বিয়ে করেছে। আমি যাচ্ছি তাকে ধরতে।

নিজে সে ভিতরে যায়নি ; মনে হয়েছিল—জ্যোতি হয়তো চলে যাবে এই সুযোগে।

চটী জোড়াটা পায়ে প'রে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল। কিছু দূর গেছে এমন সময় যমুনার মা বাড়ীর দরজা থেকে তাকে চীৎকার করে ডেকেছিল—দিদিমণি। গোপা-দি ; মা ডাকছে, গোপা দিদিমণি।

গোপা ফেরেনি। ফিরে তাকায়নি ; জ্যোতিকে পিছনে ফেলে তার আগে আগে হন হন করে এগিয়ে চলতে সুরু করেছিল। জ্যোতি তাকে বাধ্য হয়ে অনুসরণ করে চলেছিল। ভোরের কলকাতার পথ। সূর্য তখনও ওঠেনি—মানুষ জনের ভিড় নেই ; রাস্তা ভিজে সপসপ করছে তখনও ; কাক নেমেছে, নর্দমার ধারে বসে খুঁটে খাচ্ছে আবর্জনা, কুকুর ঘুরছে ; ঝিয়েরা ডাষ্টবিনে এনে ফেলছে গৃহস্থ বাড়ীর রাত্রের উচ্ছিষ্ট। গাড়ী রিক্সা এসব তখনও ভিড় করে বের হয়নি। বড় রাস্তায় মোড় ফিরে ভিড় বেড়েছিল, দূরে

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ট্রামের শব্দ উঠছে, বাস চলছে। বাগবাজার ষ্ট্রিটের দুপাশের দোকানগুলো সবে খুলেছে, এখনও মাটির ধূপুচীর মধ্যে জলন্ত টিকের উপর দেওয়া ধূপের ধোঁয়া উঠছিল। শুধু রেষ্টুরেন্টগুলোতেই ব্যবসা তখন মোটামুটি চলতে সুরু করেছে; টেবিলের সামনে প্রায় চেয়ারেই লোক বসে আছে চায়ের অপেক্ষায়। বড় ড্রামের জলে বা বেসিনে ছোকরাগুলো কাপডিস ধুচ্ছে। দু-একটা দোকানের বেয়াড়া ছোকরা একটা দুটো বিশ্রী হাঁক মেরে উঠছে—গ্রম চা।

জ্যোতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গোপার মনে হয়েছিল জ্যোতি চা খেয়েছে তো? পরক্ষণেই মনে হল, তারই খাওয়া হয়নি, ষ্টোভের উপর জলটা চাপিয়েই সে চলে এসেছে। তার অবশ্য আর চায়ের তৃষ্ণা নেই কিন্তু জ্যোতির তো আছে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—

—চা খাওয়া হয়নি তো আপনার?

জ্যোতি বলেছিল—তা হোক।

—না—তা হলে খেয়ে নিন।

—না। চলুন। আপনিও তো খাননি।

—না। আপনি খান।

মৃদুস্বরে জ্যোতি বলেছিল—চলুন, হাওড়ায় খাব—। এখানে চা খেতে বসব সকালে—বিকেলে শুনতে পাবেন—।

হ্যাঁ। কথাটা মনে হয়নি গোপার। ঠিক কথা। খুব সত্যি কথা বলেছে জ্যোতি। মানুষের মধ্যে পঙ্কভূত মাছির প্রবৃত্তি একটা মৌলিক প্রবৃত্তি।

সামনের রেষ্টুরেন্টের বারান্দায় বসে একটা দাড়ীচুলওলা পাগল তার ভাঁড় নিয়ে বসে আছে চা খাবে। দোকানে বেশ সুস্থভাবেই বসে আছে। এ অঞ্চলের খুব জানা পাগল। রাস্তায় নামলেই অশ্লীল গালিগালাজ দিয়ে চলতে সুরু করবে। লোকটা এখান-

কারই লোক—একটা মেয়েকে ভালবেসে পাগল হয়ে গেছে। বখা উড়িয়া ছোকরা কেষ্টা এখানকার বয়। এখানে বসা কোনমনেই ঠিক হবে না।

চলতে লাগল তারা। জ্যোতি বললে—দেখুন—আসানসোল যাবার ট্রেন অনেক। সকাল থেকেই ট্রেন আছে। আমার বিশ্বাস তারা যত শীগ্‌গীর পারে চলে যাবে। কারণ সৌরীনদার ভয় আছে আপনারা গিয়ে কোন হাঙ্গামা করবেন।

ব্যঙ্গভরে গোপা বলেছিল—ভয় ?—

—হ্যাঁ। ভয় না হোক একটা অশান্তি তো বলতে পারেন। মানে আমি বলছি ধরতে হলে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হয়। —একখানা ট্যাক্সি—

—হ্যাঁ সেই ভাল।

দু'জনে হন হন করে হাঁটতে সুরু করেছিল। এবং ট্যাক্সি পেয়ে ছুটে গিয়ে জ্যোতি ট্যাক্সিটার হাতল ধরে তাকে ডেকেছিল—আসুন —আসুন।

ছুটেই গিয়ে গোপা গাড়ীতে উঠে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে —বাবাঃ!

—খুব হাঁপিয়ে পড়েছেন ?

—হ্যাঁ তা পড়েছি।

—একটা সিগারেট খাব?

—খান না।

—আপনার অসুবিধে—

—না—না—না। আপনি আমার জন্যে যা করলেন!

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জ্যোতি বলেছিল—আচ্ছা হঠাৎ আমরা আপনি-আপনি হয়ে গেলাম কেমন করে বলুন তো?

স্বাধীনতার সময় আমরা পাশাপাশি সেই ফ্ল্যাগ বয়ে মার্চ করেছি—মনে নিশ্চয় পড়ে।

—নিশ্চয় পড়ে। তার মুখের দিকে তাকালে গোপা। তার ক্ষুব্ধ অপ্রসন্ন মুখের উপর একটি প্রসন্নতার দীপ্তি উঁকি মারতে সুরু করেছে। সুখের স্মৃতি স্মরণে যে মিষ্টি হাসি আপনি ঠোঁটে ফোটে—তাও ফুটেছে তখন।

—তবে? জ্যোতি প্রশ্ন করলে।

—তবের উত্তর তো একা আমি দেব না, আপনাকেও দিতে হবে। আপনিও তো, আপনি আপনি বলছেন।

—না—আমি তুমি বলেই সুরু করেছিলাম। আপনিই উত্তরে আপনি সুরু করলেন।

—হবে। 'এখবরে আমার কিছুই ঠিক ছিল না। কিন্তু এখনও তুমি আপনি চালাচ্ছ।

—ক্ষমা চাচ্ছি।

—তা করলাম। বলতে বলতেই সে বললে—বেশ মিষ্টি গন্ধ তো সিগারেটটার।

—কাল সৌরেনদার বিয়ের পর হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম—সেখানকার সিগারেট দামী সিগারেট—ফাইভ ফিফটি ফাইভ।

বলতে বলতে কখন যে হাওড়া ব্রিজের মুখে এসে পৌঁচেছিল তা বুঝতে পারেনি। ব্রিজে উঠে কথাবার্তার মোড় ফিরল।—

হঠাৎ গোপাই বললে—ওই তো ওই ট্যাক্সিটায় দাদা না?

হ্যাঁ—ওই তো মণিকা। ওই তো।

ট্যাক্সিটা তাদের ট্যাক্সিকে পাশে রেখে এগিয়ে বেরিয়ে গেল—ডবলু বি টি ০০০০ ওই তো। ওই তো।

॥ সাত ॥

—হ্যাঁ গোপা। হ্যাঁ। একটি পুরুষ যখন সত্যিকালের পুরুষ হয়ে ওঠে তখন তার কাছে একটি নারীর মূল্যই সব থেকে বেশী। সংসার সমাজ মা বাপ ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, ধন-রত্ন এমন কি জীবন থেকেও তার দাম বেশী। ধর্ম ভগবান—সমস্ত থেকে বেশী।

গোপার আজও কথাগুলো অক্ষরে-অক্ষরে মনে আছে।

সে বলেছিল—কিন্তু তোমার মা তো—! সে যদি তোমাকে মেরে ফেলত আঁতুড়ে?

তা হলে তাকে পুলিশে ধরত। ফাঁসী হত। অন্তত ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ।

—সেই তার ভাল ছিল। জীবনে এত দুঃখ সইতে হত না।

সৌরীন বলেছিল—প্লিজ, প্লিজ গোপা; প্লিজ স্টপ। আমাকে ক্ষমা কর। বিয়ে করে জীবনে সংসার পাততে চলেছি—অনাবশ্যক মন তিক্ত করে তুলিস নে। শাপ শাপান্ততে কিচ্ছু হয় না কিন্তু স্বাদটা বড় খারাপ।

মণিকা তার এককালের সহপাঠিনী—সে মুখভার করে দাঁড়িয়েছিল—সে হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠেছিল—কেন, আমরা তোমাদের কাছে অপরাধটা কি করেছি বল তো? এমন করে হাওড়া ষ্টেশন পর্যন্ত তাড়া করে মন্দ কথা বলতে এসেছ!

—আমি যতটুকু পারি পাঠাব। যা পারি।

মণিকা বলে উঠেছিল—মাইনে তো দুশো পঁচিশ টাকা তার আর কি নিজে খাবে, আমাকে খাওয়াবে—আর ওদের পাঠাবে বল তো!

উত্তেজনাবশে কানে আঙুল দিয়েছিল গোপা। এবং বলেছিল —টাকার জন্যে ছুটে এসেছি, না? তাই ভেবেছ? ছি-ছি-ছি?

* * *

এ জীবনের নাটকে সৌরীনের চরিত্রের সমাপ্তি এখানেই। আর নেই। অন্তত সশরীরে জীবন রঙ্গমঞ্চে আর আবির্ভূত হয়নি।

নিদারুণ তিক্ততা ও ক্ষোভের মধ্যেই গোপা তাকে বিদায় দিয়েছিল। ট্রেনখানা চলে গিয়েছিল। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল গোপা। চোখ দুটো তার জ্বালা করছিল।

মিলিয়ে গেল ট্রেনখানা; প্লাটফর্ম পার হয়ে খানিকটা ডানহাতি বেঁকে হাওড়ার রাস্তার তলা দিয়ে ক্রমশঃ পশ্চিমমুখে চলে গেল। শুধু ধোঁয়ার একটা পুঞ্জ ভেসে রইল শূন্যলোকে। সেখানে আরও অনেক গাড়ীর ওগরানো ধোঁয়া ভাসছে, তারই সঙ্গে মিশেও গেল এবং ক্রমশঃ ফিকে হয়ে মিলিয়েও গেল।

গোপার মনের মধ্যে ক্ষোভের পুঞ্জটাও ঠিক ওইভাবে ফিকে হয়ে এসে এসে মিলিয়ে ঠিক যায়নি—পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছিল অভিমানে। চোখ ফেটে জল এসেছিল।

প্রথম ফোঁটা দুয়েক জল টপ টপ করে ঝরে পড়েছিল প্লাটফর্মের উপর। তারপর একটা দুরন্ত আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠেছিল; আর সে সামলাতে পারেনি, নিজের আঁচলটা চোখে মুখে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

—গোপা! গোপা! সেই মুহূর্তে জ্যোতি তার কাঁধের উপর হাত দিয়ে ঈষৎ চাপ দিয়ে ঈষৎ ব্যস্তভাবেই বলে উঠেছিল—গোপা—গোপা! কেঁদো না। গোপা!

সে-স্পর্শের মধ্যে একটা স্বাদ ছিল।

সহানুভূতির সঙ্গে স্নেহ থাকে চিরকাল; এত বোধহয় তা ছাড়াও

আরও কিছু ছিল। শরীরের রোমকূপে-কূপে সে স্পর্শে—ওই বাস্তব হাতের স্পর্শের উত্তাপে একটা রোমাঞ্চ বয়ে গিয়েছিল। বেশ মনে পড়ছে, গিয়েছিল। একটু যেন চমকে গিয়েছে সারা অঙ্গ।

—গোপা!

গোপার মনে আরও সমাদরের একটি তৃষ্ণা জেগেছিল। কাপড়ে মুখ ঢেকেই সে বার বার ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না-না-না।

তার অর্থ নিশ্চয় এই ছিল যে, থামতে বলো না, বলো না, আমি কাঁদি।

জ্যোতি এবার বলেছিল—গোপা এবার বিপদ ঘটবে। কেঁদো না। পুলিশে ধরে তো কেলেঙ্কারী করে ছাড়বে।

এবার ভয় পেয়েছিল গোপা। বিস্ময়েরও শেষ ছিল না। কিন্তু কান্না তার এক মুহূর্তেই থেমেছিল এতে। সে চোখ মুছে মুখ তুলে বলেছিল—পুলিশে ধরবে কেন?

কেন? ভাববে তোমাকে আমি ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি, পালিয়ে যাচ্ছি, হাওড়া ষ্টেশনে এসে তোমার মন কেমন করতে সুরু করেছে—তুমি কাঁদছ।

—মিথ্যে মিথ্যে ধরলেই হল! ধরুক না।

—হ্যাঁ, তারপর হাজত। তারপর পাড়ায় এনকোয়ারি—।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল গোপা! এতো বড় জুলুম।

—নিশ্চয়। কিন্তু কি করবে? এই ছেলেমেয়ের পালানোর তো আর আদি অন্ত নেই। প্রতি ট্রেনেই হয় তো একজোড়া আধজোড়া পালায়।

আধজোড়া মানে—মেয়ে একলা পালায়। আর কলকাতা শহরে এবং সারা দুনিয়া জুড়ে যে কত পালায় তার আর হিসেব নেই। এখন চল। বাড়ী ফিরে চল।

ট্যাক্সি করেই তারা বাড়ী ফিরে এসেছিল।

নাটকের সূত্রধার বিধাতা পুরুষ একগাছি রাঙা সুতোর এ প্রান্তটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন জ্যোতির হাতে, অন্য প্রান্তটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন গোপার হাতে। বলেছিলেন—গ্রন্থি দিয়ে পরস্পরকে বেঁধে নাও। ইঙ্গিতেই বলেছিলেন। স্পষ্টভাবে নয়।

সেদিন ফেরবার পথে ওদিক দিয়ে মন হাঁটেই নি। নাগিনী কন্যার কাহিনী বলে একখানা বইয়ে সে মনসা পূজোর কথা পড়েছে তাতে এক মানুষের মেয়ে নাগলোকে গিয়ে পড়েছিল ; তাকে মা মনসা বলেছিলেন সবদিক পানে তাকিয়ো মা—শুধু দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না।

সেদিন যেন তেমনি একটি মানার নিষেধ মনের উপর কেউ জারী করে দিয়েছিল। যাবার সময়েও পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল। আসবার সময় কিন্তু তাকায়নি। আসবার পথে গোপার মনে চিন্তার আর শেষ ছিল না।

দুনিয়ার ছকে সে আর মা কেবল রইল। আর কেউ না। বাবা গেছে দিদি গেছে দাদা গেল—রইল সে আর মা।

ভাবতে ভাবতেই বাড়ী ফিরেছিল।

সামনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসেছিল। ওই একটি কথা ছাড়া আর কিছু ভেবেছিল কিনা—তা তার মনে পড়ছে না। না ; এতকাল পরেও ওই কটি কথাই মনে আছে—"সে আর মা—দু জন ছাড়া আর সব চলে গেল।" বাবা মরে গেছে দিদি গেছে ; দাদা গেল। রইল সে আর মা। এছাড়া আর কিছু বলেছিল বা ভেবেছিল বলে মনে নেই। এত বছর—১৯৫১ ও ১৯৬৪ সাল—চৌদ্দ বছর পরেও ওই কথা কটা মনে আছে, আর কিছু মনে নেই।

আজ এই ১৯৬৭ সালে এই মে মাসের রাত্রে দুঃখের বেদনার মন্থনে অন্তরটা আলোড়িত হয়ে তলায় থিতিয়ে পড়া কথা-স্মৃতি আশ্চর্যভাবে উপরতলায় ঘুলিয়ে তুলে দিয়েছে। ভাল করে ছেঁকে-ছেঁকে বেছে বেছে দেখে নিয়েও তো আর কোন কথা বলেছিল বা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে না।

না। ফেরবার সময় সে একবারও জ্যোতির দিকে ফিরে তাকায় নি। না। ওই প্ল্যাটফর্মে তার সঙ্গে যে কথাগুলো হয়েছিল—সেই বিচিত্র, পুলিশের কথা জড়ানো কথাগুলি। হোক বিচিত্র কিন্তু অবাস্তব বা আজগুবি নয়; মেয়ে আর ছেলে পালানো এবং ধরাপড়া—এখবর প্রতিদিনের খবরের কাগজেই আছে।

বিস্ময়ের কিছু নেই।

হ্যাঁ—১৯৫১ সালে মনে মনে সে তাই স্বীকার করেছিল। কারণ তার বয়স তখন ১৮, কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে, নানান ধরনের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। জীবনের অনেক কিছু বুঝেছে। পুরুষ আর নারীর জীবনে দেহে এবং মনে যৌবন এলে তার যে উত্তাপ—সে উত্তাপে নির্মল জলে ঝাঁপ দেবার সুযোগ না হলে—পঙ্ক-পল্লল পেলে তাতেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবে।

সে অবশ্য তা পড়েনি। তবে বন্ধ ঘরে ঠাণ্ডা মেঝেতে খালিগায়ে গড়াগড়ি খেয়েছে। কতদিন কত কল্পনা করেছে। কিন্তু সেদিন হাওড়া থেকে ট্যাক্সিতে ফেরার পথে—জ্যোতিপ্রসাদের পাশে বসে এসব ভাবনা ভাবেনি। অথচ প্লাটফর্মে জ্যোতি তার পিঠে হাত রাখলে সে একবার চমকে উঠেছিল। বিচিত্র মানুষ—বিচিত্রতর তার মন। আলো ছায়ার খেলার মত একটা যায় একটা আসে। যখন যেটা যায় তখন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব মুছে যায়।

গাড়ী থেকে নেমেছিল—তাদের গলির মোড়ে। তখন আর

তার নারীপুরুষের রূঢ়তম এবং তীব্রতম সত্য সম্বন্ধ সম্পর্কে কোন সচেতনতা ছিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাড়ী থেকে নেমে বলেছিল—তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম। দিলাম অকারণে।

—না-না। সে কি? এমন করে বলছ কেন?

—বলছি, সত্যিই বলছি।

—না-তা সত্য নয়। অন্তত আমার দিক থেকে।

—অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। বলেই সে গলির দিকে মোড় ফিরেছিল।—আচ্ছা চলি।

বাড়ীতে এসে দেখেছিল আর এক বিপদ—মা পড়ে গিয়ে প্রায় পাখানা ভেঙে ফেলেছেন। যমুনার মা তাকে আগলে বসে আছে।

মা বলেছিল—কেন গিয়েছিলি? কি হল? এল?—

সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

মা কণ্ঠস্বরে আগুনের হল্কা মিশিয়ে আবার বলেছিল—ক সের চোখের জল ঢাললি? কটা লাথি খেলি তার?

কি উত্তর দেবে?

মা বলেছিল—তুই-তুই-তুই ফিরলি যে বড়।

এতেও তার জ্যোতিপ্রসাদের কথা মনে হয় নি। কারণ মনে রয়েছে সে এর জবাবে বলেছিল—তুমি যে মরনি এখনও। তুমি মর চিতায় পোড়—তারপর তা থেকে আমার চুলো আমি জ্বেলে নেব।

মা-ও বলতে পারে নি কিছু জ্যোতিপ্রসাদকে নিয়ে। সে তো জানত যে গোপা জ্যোতির সঙ্গেই গেছে হাওড়া। নিশ্চয় শুনেছিল যমুনার মার কাছে। তবু বলেনি। কথাটা তারও মনে হয়নি।

অথচ নাটকের সুরু তখন হয়ে গেছে। জীবন রঙ্গমঞ্চের একটি রঙীন সূতোর একপ্রান্ত ধরে জ্যোতি চলে গেছে দুটো গলির পর তাদের গলিটায়—আর সে ফিরে এসেছে তাদের বাড়ীতে সেই সূতোরই আর এক প্রান্ত হাতে করে।

॥ আট ॥

সেদিন সারা দিনটা সে ক্ষোভে বনের একটা আগুনধরা মরাগাছের কাণ্ডের মত গুমে গুমে জ্বলেছিল। কখনও শিখা জ্বালিয়ে কখনও ধোঁয়ায় চারিপাশটা আচ্ছন্ন করে সে জ্বলেছিল—নিজে পুড়েছিল এবং আশপাশ আকাশ বাতাসকে উত্তাপে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল।

জীবনে যত জ্বালা আছে সংসারের কারণে, যত জ্বালা আছে যৌবন কামনায় যৌবন জ্বলায়, দারুণ ক্ষোভে সে সেদিন এইসব জ্বালাগুলোকেই পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল। ঠিক করেছিল এসবের কোনটাকে সে প্রশ্রয় দেবে না। জীবনে অকারণে মদন ভস্ম করতে চেয়েছিল।

ছি-ছি-ছি।

মানুষ এমন কামার্ত। এমনভাবে পশুর থেকেও স্বার্থপর হতে পারে? অনায়াসে সৌরীন মনিকাকে নিয়ে একটা জন্তু মেয়ের সঙ্গে কামার্ত একটা জন্তু পুরুষের মত চলে গেল।

সারাটা দিন সে এই ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল প্রাণপণ একটা জেদের বশে, জোর করে।

মায়ের কাছেও বসেনি ভাল করে। মা যে গালাগাল এবং শাপশাপান্তগুলো করছিল সেও তার খুব ভাল লাগছিল না। তার কারণ ওদের গাল দিতে দিতে মা বার বার ঘুরে ফিরে তারই কথাতে আসছিলেন—এ কালটাই এমনি। এবার ঐটার পালা। সাপ সাপ সব, দুধ-কলা দিয়ে বড় কর—তারপর একদিন বুকে ছোবল, মেরে দিয়ে চলে যাবে। এটাও যাবে। আজ, নয় কাল, নয় পরশু।

তার মনে হচ্ছিল তীব্র চীৎকারে প্রতিবাদ করে উঠে বলে—তার থেকে তুমি মরে যাও না। মরে গিয়ে তুমি স্বর্গে যাও বৈকুণ্ঠে যাও,—তা অবশ্য তুমি যাবে না—কারণ নরেশ গুপ্তের প্রগ্রেসিভ আইডিয়ার সোরস ছিলে তুমি, ফোর্স ছিলে তুমি। পার্ক সার্কাসে ওই বাড়ীতে যাব বলে তুমিই জেদ ধরেছিলে। আমি তখন আট-ন বছরের। মুর্গী তুমি পুষিয়েছিলে। আজ খুব বিধবা সেজেছ। অভিসম্পাত দিচ্ছ।

কিন্তু কিচ্ছু না বলে মুখ বন্ধ করে কাজই করেছিল। রান্না করে খাবার এনে সামনে ধরে দিয়েছিল। জলের গ্লাস নামিয়ে দিয়েছিল। পান সেজে জরদা পর্যন্ত এনে সামনে নামিয়ে দিয়েছিল।

বিকেলবেলা মা ডেকে কথা বলেছিল। সে সৌরীনের ঘরটার কাগজপত্র ঘাঁটছিল। আবিষ্কারের কোন প্রয়োজনই ছিল না- তবু মণিকার সঙ্গে সৌরীনের সম্পর্কটা গড়ে শক্ত হয়ে এমন হয়ে ওঠার কথা কাহিনী খুঁজছিল। সৌরীনের লেখা কাগজপত্র থেকে তার মনের কথা—এবং মণিকার চিঠি থেকে গোপন কাহিনী। খান ছয়েক চিঠি সে পেয়েছিল—তার থেকেই তার এই খোঁজার নেশা বা ঝোঁক জেগে উঠেছিল।

নিজের স্যুটকেস জামা কাপড় সব যে কখন সৌরীন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা গোপা বা গোপার মা জানতে পারেনি। বড় একটি ট্রাঙ্ক পড়েছিল—সেটা প্রায় খালি, কয়েকটা পুরনো জামা—ফুটবল খেলার ইউনিফর্ম গেঞ্জি ছাড়া আর ট্রাঙ্কটা খালি। সেই ট্রাঙ্কের তলায় একখানা খাম পেয়েছিল। নাম লেখা ছিল সৌরীনের, লেখাটা দেখে মনে হয়েছিল—মণিকার হতে পারে। নামের পাশে লেখা ছিল—"সিক্রেট এ্যাণ্ড আরজেণ্ট।"

চিঠিখানা মণিকার চিঠিই বটে। লিখেছে, হোটেলে যারা

তোমাকে বলেছে যে আগেও তারা আমাকে দেখেছে ওখানে তারা হাফট্রুথ বলেছে। যে-কোন শপথ আমাকে করতে বলবে—আমি করতে পারি। তুমি জান সেক্স সংক্রান্ত যে কাগজখানায় আমার ছবি দেখে আমার প্রতি নতুন করে এ্যাট্রাটেড হয়েছ—তার আপিস ওই হোটেলটার নিচের তলায়। আমি ফটোর জন্যে পোজ দিয়ে টাকা আনতে গিয়েছি ওখানে। হোটেলের যে-সব ব্রোকার আছে তারা আমাকে অনেকবার লোভ দেখিয়েছে। আমি ঈশ্বরের নামে মেরীর নামে শপথ করে বলতে পারি এই হোটেলে তোমার সঙ্গেই আমি প্রথম পদার্পণ করেছি এবং তোমাকে তুমি বলে চিনেই তবে মনের কৌতুকবশে তোমাকে পাকড়াও করব বলেই এসেছিলাম। তুমি মণিকাকে ভুলে গিয়েছিলে—মণিকা তোমাকে ভোলে নি। এসপ্লানেডে সন্ধ্যেবেলা তুমি অন্যমনস্কভাবে শুধু কেবল মেয়েদের দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিলে তখনই আমি তোমাকে চিনে ছিলাম—মতলব বুঝেছিলাম এবং ইচ্ছে করেই এই হোটেলটায়—যে হোটেলটা ওই কাগজের উপর তলায় বলে খানিকটা চেনা—সেখানেই তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলাম।

অত্যন্ত কৌতূহল জেগেছিল তার। সে খুঁজতে আরম্ভ করেছিল ট্রাঙ্কটা। আর বিশেষ কিছু পায় নি। পেয়েছিল সেকস সম্পর্কিত খান-দুই সাময়িক পত্রিকা। তাতে ছবি ছাপা হয়েছে, কিছু কিছু বিচিত্রভাবে ছাপা, বিজ্ঞানকে বড় করা হয়েছে এমনি একটা ভানই হোক অথবা কৌশলই হোক একটা কিছু আছে। একটি নারীদেহ—অনাবৃত কিন্তু তার মুখ নেই। গলা থেকে পা পর্যন্ত ছবি ছাপা হয়েছে। অনেক রকমের ছবি। শুধু সামনের মলাটে মণিকার বাষ্ট ফটো ছাপা হয়েছে।

বইখানা ওল্টাতে ওল্টাতে মানুষের মানুষীর জীবনের বিচিত্র গল্প, বিস্ময়কর গোপন সত্য কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করেছে—জীবনে খাদ্যে বঞ্চিত হয়ে অনাহারে দু-দিন তিনদিন মুখ বুজে থাকে মানুষ। তারপর কুড়িয়ে খায়—চুরি করে, কঙ্কালসার দেহে মানুষের দোরে গিয়ে হাত পাতে। জীবনে আরও ক্ষুধা তো আছে, দেহের ক্ষুধা—

গোপা এবার সভয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল বইখানা, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এবং পালিয়ে এসেছিল ঘর থেকে বেরিয়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ ও থাকতে পারেনি—ও ঘর থেকে দূরে। আবার গিয়েছিল ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে। চোরের মত। আবার পালিয়ে এসেছিল। আবার গিয়েছিল।

মাঝখান থেকে বাঁচিয়েছিল মা।

মা এতক্ষণে তাকে ডেকেছিল ; —গোপা!—

গোপার বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠে যেন থেমে যাবে বলে মনে হয়েছিল—। মা আবার ডেকেছিল—শুনছিস?

গোপা! শোন! মায়ের উপর রাগ করে না। শোন।

ওই কথা কয়টার সাড়ায় এবং মায়ের কণ্ঠের সুরে তার মনের ওই প্রলুব্ধ ক্ষুধা, যে ক্ষুধা প্রলুব্ধ হয়েও সারা দেহের সর্বাঙ্গে অনুভব করছিল,—তা যেন এক মুহূর্তে আলোর ছটায় অন্ধকারের মত মরে গিয়েছিল।

মা তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল—আমার পায়ের যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ বাড়ছে রে। ওবেলা তুই হেঁকে বলে চলে গেলি—আমি রাগে যেন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। কোন মতে সামলে বললাম—যমুনার মা—বারণ কর। বারণ কর। তুই শুনলি নে

চলে গেলি। আমি এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম—এমন দিশেহারা হলাম যে, জ্ঞান ঠিক ছিল না আমার। সেই অবস্থায় সিঁড়ি থেকে নামতে একটার বদলে দুটো ডিঙিয়ে পা ফেলেছি। ফেলেই কোমরে ধাক্কা লাগাল, হাঁটুতে ধাক্কা লাগল—পড়ে গেলাম আছাড় খেয়ে। তারপর উঠতে পারিনে। কাঁটাপুকুর থেকে বটঠাকুরকে খবর পাঠালাম। উনি দেখে বললেন—হাড় ভেঙে থাকলে মুস্কিল। তবে বড় কিছু হয় নি বলেই মনে লাগে। ডাক্তারেরা বলে বরফ দিতে। আমরা বলি সেঁক দাও। লবণের পোঁটলা করে গরম গরম সেঁক দাও। দেখ কেমন থাক। বাড়লে পর বুঝতে হবে কঠিন কিছু। এক্স-রে করাতে হবে। যড়পঙ্ক থাকলে বেঁটে প্রলেপ দিলে হত।

চুপ করে বসে শুনে গেল গোপা। মনে অনুতাপ না-হোক, মায়ের জন্য দুঃখ হয়েছিল তার। সত্যিকারের করুণতম দুঃখ অনুভব করেছিল বিচিত্র ভাগ্যের খেলার পুতুল এই তাদের মা মেয়েটির জন্যে —যিনি একদা ছিলেন প্রগতিশীল নরেশ গুপ্তের প্রগতিশীলা স্ত্রী, এবং যিনি পরবর্তীকালে সৌরীনের ও গোপার মা—যে মা সকালে উঠে বের হত প্রাইভেট টিউশনি করতে; সেখান থেকে ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে এসে রান্না সম্পূর্ণ করত; তারপর সৌরীনের এবং গোপার তার সঙ্গে তার নিজের কাপড় ব্লাউস সায়া কামিজ প্যান্ট পর্যন্ত সার্ফে কেচে শুকুতে দিয়ে স্নান করত, খেতো, বিশ্রাম করত; আবার চারটের সময় উঠে—সেই শুকানো জামা কাপড় প্যান্ট স্টার্চ দিয়ে ইস্ত্রী করে পাট করে রেখে তাদের জন্যে জলখাবার করতে বসত; খুট করে শব্দ হলেই জিজ্ঞাসা করত—কে গোপা? যমুনার মা—গোপা এল? এল না? তবে শব্দটা কিসের?

কাল তার আগের দিন সৌরীনের ম্যাচ ছিল। কিন্তু পায়ে ছিল বেদনা। এই জখম পা নিয়ে মা বারণ করেছিল খেলতে কিন্তু

সৌরীন শোনে নি। খেলতেই হবে। বি ডিভিসনের টিম থেকে তাকে আসছে বার এ ডিভিসনে যেতেই হবে। ঠেলে গিয়ে ঢুকতে সে বদ্ধপরিকর। এ ম্যাচটায় খেলবেই সে এবং স্কোর তাকে করতেই হবে।

মা সারাদিন বকেছিল আপন মনে। খেলোয়াড়দের জীবনকে মা পছন্দ করে না বলে সৌরীনকে তিরস্কার করেছিল, নিজের ভাগ্যকে বাক্যে যতটা লাঞ্ছিত করা চলে তাও করেছিল। কখনও কখনও নিজের কপালে দুটো চারটে চড়ও মেরেছিল— আর বলেছিল এততেও ভাঙে না ফাটে না? পাষাণে-গড়া! ছি!

বলতে বলতেই বলেছিল—নাও বস'—পাখানা মেলে দাও—। ভাল করে মেলো। একটু সরে বস। উনুনের আঁচটা ষোল আনা মুখে লাগছে। মুখ তো ভেতরে ভেতরে পুড়ছে—তার উপর আর বাইরে পোড়ানো কেন।

বলে নূনের পোঁটলার সেঁক দিতে বসেছিল। আগের দিন গোটা সন্ধ্যা সেঁক দিয়েছিল; পরের দিন ঘণ্টা দুই আড়াই দুপুর পর্যন্ত। তার সঙ্গে মালিশও করে দিয়েছিল। ছেলে প্রণাম করতে গেলে বলেছিল—থাক—। ঢের হয়েছে। ইউনিফর্ম পরে বেরিয়ে যাবার সময়ও বলেছিল—দেখিস মারামারি করে যেন বিশ্রী কিছু করে আসিস নি বাপু!

* * *

এই তাদের মা। এমন মা সুলভ নয়। কিন্তু সুলভ মা যারা, তাদের উপরেই কি এই অবস্থায় রাগ করা চলে।

গোপা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—যন্ত্রণা কি খুব বেশী হচ্ছে?

—হচ্ছে—। তবে খুব বেশী বলতে কি বলছিস?

সারা মুখে তার যন্ত্রণার চিহ্ন রেখায় রেখায় ফুটে উঠতে চাচ্ছে।

তারই মধ্যে হেসে বলেছে—অজ্ঞান তো হইনি! তবে কন্ কন্ করছে। বেশ কন্ কন্ করছে।

—তা হলে, যাব—ডাক্তার ডেকে আনব?

—ডাক্তার কি করবে? বলবে এক্স রে করতে। তার থেকে —দুটো সারিডন কি কোডোপাইরিন কিনে আন। যমুনার মাকে বল।

—আমিই যাই—। বরং জিজ্ঞাসা করে আসব—ডাক্তার দাসকে। ওঁর ডাক্তারখানাতেই যাব।

—না। যমুনার-মা যাক্। তোকে যার জন্যে ডেকেছি বলি। কাল সকালে তো টিউশনিতে যেতে পারব না আমি। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা?

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গোপা। সত্যিই ওই ছোট তিনটি বাক্য—'বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা?'—তার মনশ্চক্ষুর সামনে একটা নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের সম্মুখ থেকে একটি আড়ালকে সরিয়ে নিল।

মা বললে—তুই কাল সকালে উঠে আমার বদলে যাবি। আমি চিঠি লিখে রাখছি—তুই বাড়ীতেই, লোক ওরা ভালই। তা—আমার বদলে তোকে এখন নিশ্চয় নেবে। তবে বেশীদিন হলেই মুস্কিল! এই মায়ের উপর রাগ করেছিল বলে মনে মনে অনুতাপ করেছিল সে।

মা সারারাত কাতরেছিল। যন্ত্রণা বাড়ছিল। সে মায়ের পাশে শুয়েছিল। ঘুম তার ভাল হয়নি। জেগেছিল প্রায় দেড়টা পর্যন্ত। তারপর আধ ঘুমের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চিন্তার শেষ ছিল না।

দাদা মণিকা—আসানসোলে ফুলশয্যা পেতেছে আজ। দুটো

মানুষ নয়। মানুষের দেহের মধ্যে দুটো বন্য বর্বর পুরুষ প্রকৃতি আর নারী প্রকৃতি।

সেই মাসিক পত্রিকখানায় প্রকাশিত কতকগুলো বিবরণ মনে পড়েছিল। ছি-ছি-ছি!

একজন স্বামী লিখেছে—তার নববিবাহিত বধূ সম্পর্কে—। দেহ নিয়ে তার উল্লাস সাইক্লোনের রাত্রির মত—।

শিউরে উঠেছিল সে! হয় তো মণিকা—

থাক। থাক। ছি। ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল সে। দাদা মণিকা দূরান্তরে কোন অরণ্যের অরণ্যচারী হয়ে হারিয়ে যাক। মনকে সে জোর করে ফিরিয়েছিল। কাল সকালেই মায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কাল সে যাবে মায়ের চিঠি নিয়ে—এবং কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে আসবে। বলে আসবে—এক্‌সরেটা করিয়ে নি! মায়ের একটা ব্যবস্থা করে আমি আসব।

এক্‌স-রের জন্য ডাক্তারের চিঠি চাই।—কম ফিয়ে হলে ভাল হয়। একলা তাকে সব করতে হবে। হায় দাদা—।

থাক, দাদার কথা থাক।

কাল জেঠামশায়ের ওখানে যাবে। জেঠামশায়ের কাছে যেতে তার খুব ভাল লাগে না। একটা প্রচ্ছন্ন—

না—হয় জ্যোতিকে বলবে। জ্যোতিপ্রসাদের কথা মনে হল। আজ সে অনেক করেছে তার জন্যে। কাল গিয়ে ডাকবে জ্যোতিকে। আর একবার সাহায্য করতে হবে যে!

এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কত জেগে থাকবে। ছিলকের মত ঘুম; পাতলা চাদরে যেমন কিছুটা শীত আটকায়; তেমনিভাবে পাতলা ঘুমে—জেগে থাকার রূঢ়তাকে কিছুটা কমিয়ে এনেছিল।

এরই মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছিল জ্যোতিকে। জ্যোতি এসে তার

কাঁধে ঠিক হাওড়া প্লাটফর্মের উপর যেমনভাবে হাত রেখেছিল— তেমনিভাবে,—না—তার থেকে আরও নিবিড়ভাবে হাত রেখেছিল।

সে শিউরে উঠে বলেছিল—ছাড়! ছাড়। না। কে যেন—কাতরাচ্ছে। ছাড়। স্বপ্নের জ্যোতির কাছ থেকে সরে এসে স্বপ্ন ভেঙ্গে সে জেগে উঠেছিল—মায়ের কাতরানি শুনে জিজ্ঞাসা করেছিল—।—মা। বেদনা বেড়েছে?

হ্যাঁ রে। বড্ড বেড়েছে, বড্ড।

॥ নয় ॥

মানুষের লেখা নাটকের একটা ছাঁচ আছে ; একটি ঘটনা ঘটে —তা থেকে আর একটি ঘটনা এসে উপস্থিত হয় ; তার থেকে আর, এক পরিণতি। নায়কের সঙ্গে নায়িকার দেখা হয়—প্রেমে পড়ে তারপর তৃতীয়জন আসে—সে এসে কলহ বাধায়—বিচ্ছেদ হয়—তারপর বিচিত্রভাবে আবার অঘটন আজও ঘটের মত বিচ্ছেদকে ব্যর্থ করে মিলন হয়।

বিধাতার নাটকেও তা হয়। তবে এই মোটা নিয়মের ঘটনা ছাড়াও আরও অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। তবে এই ছোট নাটকটির ধারা যেন আলাদা। গোপার জীবন ছোট, তার ঘটনাগুলিও চোখে পড়বার মত নয়।

পরদিন সকালে জ্যোতিকে সে চেয়েছিল—কিন্তু জ্যোতিকে সে পায়নি। জ্যোতির আসা উচিত ছিল কিন্তু জ্যোতি আসেনি।

ভেবেছিল সকালবেলা জ্যোতি নিজেই খোঁজ নিতে আসবে। কিন্তু তা আসে নি। সে একটু রাগ করেছিল। জ্যোতির উপর রাগ করার অধিকার আছে কিনা এ বিচার না-করেই রাগ করেছিল। সকালে তখন মায়ের যেন খানিকটা গা গরম মনে হয়েছিল। রাত্রে তো স্পষ্ট জ্বর ছিল। সকালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে জেঠামশায়ের বাড়ী গিয়েছিল। লোকের সাহায্য চাই। এক্স-রে করাবে।

জেঠামশায়ের বাড়ীতে তাঁর নিজেরই ঝঞ্ঝাট সামলাবার লোক নেই। বাড়ীতে পুরুষ বলতে তিনি নিজে ; বড় ছেলে দুবার

করোনারী ধাক্কা খেয়ে তৃতীয়বারের প্রতীক্ষায় আছে। ছোট দূর দেশে চাকরী করে। থাকবার মধ্যে পঁয়ত্রিশ বছরের এবং বত্রিশ বছরের দুই কুমারী মেয়ে ; দুই বউ আর একপাল ছেলে। বাড়ীর কাজ সে বাজার হাট থেকে সবই করে মেয়েরা, রান্না করে বউয়েরা, ছেলেগুলো খায় আর হল্লা করে—তার সঙ্গে পড়ে। অত্যন্ত রক্ষণশীল বাড়ী। তার মা এককালে পার্ক সার্কাসে ওই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, দেশী খ্রীশ্চান এবং মুসলমানদের সঙ্গে একবাড়ীতে ছিল বলে এখনও তাকে ব্যঙ্গ করে। জাঠতুতো বোনেরা বাড়ীর কাজ করেও কিছু কাজ করে। লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। দুজনেই ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙোয়নি ; তবে, কথাবার্তা বলে ভাল ; সেজেগুজে দিব্বি মডার্ণ চালে চলে। ওরা কতকগুলি জিনিস ক্যানভাস করে বিক্রী করে। তার মধ্যে জেঠামশারের আয়ুর্বেদীয় ফ্যাক্টরী অর্থাৎ তাঁর বাড়ীর তৈরী দাঁতের মাজন, ভাস্কর লবণ, ধূপকাঠি, মেচেতার জন্য লাবণ্যপ্রভা ক্রীম, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য সুখবিবেচক আর ক্ষুধা বর্ধনের জন্য ক্ষুধাবর্ধিনী মোদক। মোদকটায় শুধু ক্ষুধাই বাড়ে না—শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের মধ্যে তার সঙ্গে হয় গাঢ় ঘুম। বউরা কলে ছেলেদের জন্যে ফ্রক পেনী সার্ট জাঙ্গিয়া মেয়েদের নানা মাপের ব্লাউজ এবং নানা মাপের বালিশের ওয়াড় তৈরী করে ফেরিওলাদের দেয়। দিদি দুজনের কাজ সুরু হয় ভোরে, ফেরে তারা সন্ধ্যায়। বাড়ীতে রান্নার পালা আছে। দিনে বউদের রাত্রে মেয়েদের। আজ রাত্রে বড়দি তো কালরাত্রে ছোড়দি। করিৎকর্মা মেয়ে। এতসব করেও রাত্রের শো-য়ে দুই বোনে সিনেমা দেখে আসে।

বড়দির নাম রমা, ছোড়দি হলেন ক্ষমা। এরাই কিন্তু শেষ সাহায্য করলে।

বড়দি রমাই তাকে সঙ্গে করে সব জায়গায় নিয়ে গেল।

বিচিত্র মানুষ বড়দি রমা। রমাদিকে সে কখনও ভুলবে না। তার সান্ত্বনা রমাদির শেষ শয্যায় সে থাকতে পেরেছিল।

রমাদি—।

১৯৬৫ সালের বৈশাখের উত্তপ্ত রাত্রে রমাদিকে মনে পড়ে অস্থির হয়ে উঠল গোপা। এতক্ষণ পর্যন্ত কোন অস্থিরতা তার ছিল না। নীরবে স্থিরতার মধ্যে আশ্চর্য রকম শান্তভাবে সে পিছনটা স্মরণ করছিল—আর মধ্যে মধ্যে চোখ মুছছিল। মাঝে মাঝে জল আসছিল চোখে।—

রমাদিকে মনে করে অকস্মাৎ বেদনাটা যেন অশান্ত হয়ে উঠল। চোখ থেকে হু-হু করে জল পড়তে লাগল।

আরও দু বছর পর—১৯৫৩ সালে চল্লিশ বছর বয়সে রমাদি নিজের রক্তস্রোতের মধ্যে ছটফট করতে করতে—।—যাক সে আরও পরের কথা। সে পরেই হবে।

রমাদিকে সেদিন আশ্চর্য লেগেছিল। সব করলেন একা। সঙ্গে সে নিজে ছিল, কিন্তু সে শুধু সঙ্গে থাকাই, তাকে কিছু করতে হয়নি। ডাক্তার সার্জেন এক্সরের সব ব্যবস্থা করে দিলেন রমাদি। বারেকের জন্য আরও কেউ থাকলে ভাল হত এমন কথা মনেই হল না। জ্যোতিপ্রসাদকে মনেও পড়ল না।

মায়ের কোমরের নিচে ডানদিকের হিপ বোনে আঘাত লেগেছে; আঘাতটা বেকায়দায় পড়ে বেশ কঠিন হয়েছে। হাড় ভাঙেনি কিন্তু হাড়ীটায় চিড় খেয়েছে, বেশ একটা লম্বা ফাট ধরার মত দাগ উঠেছে প্লেটে। প্লাষ্টার করে অন্তত মাস দুই শুয়ে থাকতে হবে। প্রথম পনেরদিন হাসপাতালে থাকতে হল—তারপর বাড়ী। এ পনের দিন রমাদি এ বাড়ীতে এসে থাকতেন।

আশ্চর্য ঝকমকে মেয়ে রমাদি। ফরসা রঙ লম্বা চেহারা, দোষের মধ্যে মনে হত ভারিক্কী মেয়ে। অর্থাৎ বয়স্থা। বেণী ঝুলালে মানাতো না। এলো-খোঁপায় চমৎকার মানাতো। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরলে যেন কাঠ-কাঠ শক্ত দেখাতো। বেশ ঝলমলে করে দেশী ঢঙে কাপড় পরলে বেশ দিদিঠাকরুণ দিদিঠাকরুণ মনে হত।

জ্যোতিকে আশ্চর্যভাবে ঢেকে দিয়েছিলেন রমাদি। ভুলে গিয়েছিল প্রায়। মনে পড়বার অবকাশই হল না। দেখা হল তবু যেন কোন আকর্ষণ অনুভব করলে না। মনে হল যে সুতোটার দুই প্রান্ত বিধাতা দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন—তা দুজনের হাতে ধরাই রইল কোন বুনন তাতে হল না, কোন গ্রন্থি তাতে পড়ল না।

রমাদি তার জীবনকে পুরো একটা মাস জুড়ে রইলেন।

মা হাসপাতালে, রমাদি তাকে আগলে ছিল। আগলে ছিল মানে, রাত্রে এসে আগলে শুত। সকালে উঠে চা খেয়ে চলে যেত। আবার রাত্রে আসত। যেদিন সিনেমা যেত সেদিন তাকে নিয়ে যেত।

রাত্রে জীবনের গল্প বলত রমাদি।

প্রথম গোপাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল গোপার জীবনের গল্প। তারপর বলেছিল নিজের জীবনের কথা।

তার মধ্যে পুরুষকে ভালবাসার কথাই পনের আনা। এই বয়সে ভালবেসেছিস কি না? কজনকে বেসেছিস?

সে রাঙা হয়ে হয়ে উঠত। অস্বস্তি অনুভব করত। সে যতবার বলেছে না, ততবার হেসে রমাদি বলেছে দূর—! কেন মিছে কথা বলছিস? মাইরী বলছি কাউকে বলব না আমি।

সে প্রায় হাঁপিয়ে উঠে বলেছিল—ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি——না। না-না-না। মনে পড়ছে—না-না বললেও জ্যোতিপ্রসাদকে

মনে পড়েছিল। সেই বোকা হাবা ছেলেটা, যে তার স্কুলের সামনে থেকে পিছন নিত, তাকে মনে পড়েছিল। আরও দু'চারজনকে মনে পড়েছিল। সে মাত্র মনে পড়াই। তার সঙ্গে প্রেমের কোন সম্পর্ক ছিল না।

রমাদি জিজ্ঞাসা করেছিল—

—বেশ প্রেমে না পড়িস, তোর পেছনে লাগেনি? পুরুষ জাতটাই তো নির্লজ্জ—। ওরা তো সারাদিন-রাত ওই ভাবছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে কোথায় মেয়েরা যাচ্ছে। যেই দেখলে —আর পিছন নিলে। কলকাতায় তো রোয়াকে রোয়াকে আড্ডা। স্কুল যাস—নেয় না পেছন? মিথ্যে বলিসনে।

এবার সে বলেছিল, সেই একজন বোকা ছেলেকে বলেছিল গালে ঘুঁষি মারব সেই কথাটা। ছেলেটা কেমন কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়েছিল—সে বলে খানিকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল। এবং হেসেছিল।

ওই একটু হাসিই ক্রমে ক্রমে গভীর রাত্রি পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হাসিতে পরিণত হয়েছিল। উচ্ছ্বসিত হাসি থেকে সব শেষ পরিণতি হয়েছিল রমাদির একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসে, তারপর হঠাৎ কান্নায়।

রমাদি নিজের জীবনে এই রকম কত পুরুষের সঙ্গে কত কৌতুক করেছে কত তাদের নিয়ে খেলা করেছে, ঠকিয়েছে, লাঞ্ছনা করেছে তার কথা বলতে বলতে শেষ বলেছিল—কিন্তু বড় খারাপ রে বড় খারাপ। মেয়ের বিয়ে না হওয়া, স্বামী না-থাকা, এ বড় খারাপ। মেয়ে জাত লতার মত; একটা ডালপালাওলা শক্ত গাছের মত পুরুষ তার চাই, তাকে জড়িয়ে উঠবে ফুল ফোটাবে। যাকে জড়িয়ে উঠলে ছাগলে ভেড়ায় গরুতে ছিঁড়ে খাবে না, মাড়িয়ে যাবে না। জানিস—আজও বাবা আছে নিজের বয়স আছে, খেটে খাচ্ছি—

বাবার ঘরে আছি—এরপর নিরাশ্রয় হব। দেখবার কেউ থাকবে না।

কেঁদে ফেলেছিল রমাদি।

সে-ই বরং বলেছিল—এ তুমি আগেরকালের কথা বলছ রমাদি। আজকাল নতুন যুগ, লেখাপড়া শিখলে বেটাছেলেও যা পারে মেয়েতেও তাই পারবে। চাকরী বাকরী সব।

—হুঁ। রমাদি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। তারপর বলেছিল ম্যাট্রিক একবার ফেল করলাম, বাবা আর পড়ালো না। বড়দা চারবার ফেল করেছে সবসুদ্ধ। ম্যাট্রিক একবার আই-এ'তে একবার বি-এতে দুবার। ছোটভাই দুবার ফেল করে নিজে ছেড়ে দিলে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তুই যেন পড়া ছাড়িসনে গোপা, পড়াটা যেন চালিয়ে যাস। না-হলে। মেয়েদের নিয়ে যে কি ছিনিমিনি খেলে রে—তুই জানিস নে। পরে জানবি। খুব সাবধান গোপা, খুব সাবধান—। লেখাপড়া শেখ—চাকরী কর। আর একটা কথা—বেটাছেলের সঙ্গে মিশবি কখনও গা ছুঁতে দিবিনে। কখনও না। ওরা শয়তান। তার উপর মেয়েদের যৌবনকালে বুকে একটা লুকানো দাহ থাকে। সেই দাহের মধ্যে পুরুষের ছোঁওয়া—একেবারে ঘি ঢেলে দেয় রে একেবারে। হু-হু করে জ্বলে ওঠে। খুব সাবধান! ওদের গা ছুঁতে দিবি বিয়ের পর। তার আগে নয়। খুব সাবধান।

এত সমাদর রমাদি তাকে করেছিলেন।

*　　　*　　　*

শুধু ওই রাত্রিটিই নয়। এরপর পর পর পনের রাত্রি। পনের রাত্রি রমাদি তার কাছে এসে শুতেন। দীর্ঘাঙ্গী কাঠ কাঠ

শক্ত চেহারার রমাদিকে এ পাড়ায় লোকেরা বলত—রমা সার্জেন্ট।

সার্জেন্ট অর্থাৎ পুলিশ সার্জেন্ট।

এ-নামে এর পূর্বে গোপাও মনে মনে কৌতুক অনুভব করত। তার মাকে সে দু-চারবার রমাদি সম্পর্কে সকৌতুকে হেসে বলেছিল, রমাদিকে লোকে বলে পুলিশ সার্জেন্ট। তা রমাদির যা কাঠখোট্টা চেহারা না—তাতে ঠিক বলে। বাবা:—

মা বলেছিল—কাঠখোট্টা না-হলে চলে না। তবে একটু বেশী তা ঠিক। —তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন? কারুর সঙ্গে বুঝি কিছু হয়েছে রমার?

হয়েছিল। কিন্তু সে থাক। কথাটা কি হয়েছিল তা নিয়ে নয়। কথা কাঠখোট্টা পুলিশ সার্জেন্ট নাম দেওয়া রমাদির অন্তরের এই গোপন পরিচয়টুকু নিয়ে। রমাদির ভেতর যে আর এক রমাদি আছে তাকে নিয়ে। এ-রমাদি আশ্চর্য এবং বিচিত্র। সে এক কাঙাল মেয়ে। কদিনের মধ্যে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠে। কত কথাই যে বলেছিল, কত শিক্ষাই যে দিয়েছিল, কত বুঝানোই যে বুঝিয়েছিল—তার আর এপার ওপার নেই।

কলকাতার যে ময়দানের কথা গত মহাযুদ্ধ থেকে বিখ্যাত হয়ে আছে যেখানে অন্ধকার গাছতলায় মেয়ের দেহ বেচার হাট বসেছে, হোটেল, মাসাজ বাথ ক্লিনিক এম্পটি হাউস—বার রেষ্টুরেণ্টের কথা বলতে বাকী রাখে নি। —সিনেমার মায়াপুরী, রঙ্গমঞ্চের তাসের-ঘরের কথাও রমাদি খুব ভাল করে জানত। তাও বলেছিল। এমন কি গৃহস্থবাড়ীতে প্রচ্ছন্নভাবে মেয়ের ঘরে পুরুষ-বন্ধু আপ্যায়নের ব্যবস্থার বিচিত্র সংবাদ সব রমাদি জানত—সে সব জানা সে তাকে জানিয়েছিল।

পুরুষেরা কেমন করে ভোলায় কেমন করে উপভোগ করে চলে যায়, পালিয়ে যায়, মেয়েরা কেমনভাবে সেই ভোগের ফলকে জীবনে ধারণ করতে বাধ্য হয় সে-সব বলেছিল। এই পনের দিনের মধ্যে চার পাঁচ দিন জ্যোতির সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু তাকে দেখে মনে এতটুকু তারদিকে ঢলেনি। তাকে ডেকে সে কথা বলেনি, বলতেও যায়নি। কেন? কিসের জন্যে? জ্যোতি বোকার মত ফিরে গেছে। সে মুখ মুচকে হেসেছে। রমাদির শিক্ষায় দীক্ষায় সে যেন আর এক মেয়ে হয়ে উঠেছে।

এই পনের দিনে —। না-পনের দিন কেন—প্রায় একটা বছর রমাদি তাকে জীবনের শিক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে পনের দিন নিরঙ্কুশ ছিল তাদের পরিচয়। পনের দিন পরই মা ফিরল হাসপাতাল থেকে।

মা ফিরল, তখন উঠে দাঁড়াতে পারছে—তা হলেও ব্যথা আছে। ডাক্তারেরা বলেছে বিশ্রামের মধ্যেই সেরে যাবে। তবে রেষ্ট। রেষ্ট চাই।

তার অভাব হয়নি। রমাদিই প্ল্যান ছকে দিয়েছিল। বাড়ীতে মাকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলেছিল—খুড়ীমা—নড়াচড়া করলে যদি মরণ হত তা হলে নড়তে চড়তে বারণ করতাম না। নড়লে চড়লে কষ্ট বাড়বে আপনার, আর কষ্ট দেবেন এই মেয়েটাকে। এ ছাড়া আর কিছু হবে না। হাসপাতালে থেকে খরচ বাড়বে— বাড়ীতে শুয়ে থাকুন। যমুনার মাকে বলেছি একটা চব্বিশ ঘণ্টার লোক দেবে ও। আপনার কাছে থাকবে। গোপা যেমন সকালে টিউশন করবার করবে, যমুনার মা এদিকের কাজকর্ম করবে। মেয়েটা বাকী কাজ করবে। গোপা কলেজ করবে। মানে যেমন চলছিল তেমনি চলবে এখন। তারপর আপনি ভাল হয়ে উঠুন —

তখন আবার ভেবেচিন্তে করবেন যা হয়। আমিও আসব যাব দেখব।

মা বলেছিলেন—হুঁ। তাই হোক এখন। তবে বটঠাকুরকে একবার ডেকে আনিস সন্ধ্যাবেলা।

—কেন? বাবাকে কেন? বাবা তো খটরোগা লোক—

—আমি একবার দেখাব নিজেকে।

—বাবা আবার কি দেখবেন!

তিনি বৈদ্য আমি বৈদ্যের মেয়ে, বৈদ্যের বাড়ীর বউ। অসুখ বিশুখ সম্বন্ধে আমাদের একটা জ্ঞান আছে। আমার মনে হচ্ছে, পায়ের আমার কিছুই সারেনি। পা আমার সারবে না। আমি চিরজীবনের জন্যে অক্ষম হয়ে গেলাম।

তাই হয়েছিল। মায়ের ভুল হয়নি। তিনি নিজেই হেসে বলেছিলেন—আমি জানতাম রে। হাজার হলেও বৈদ্যের বাড়ীর মেয়ে। ছেলে বয়সে মনে আছে এমনি করে বর্ষার সময় পিছল বাঁধাঘাটে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন আমাদের গ্রামের বাবুগিন্নী। তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বছর। আমার ঠাকুরদা ছিলেন ভাল কবিরাজ। বড় বাপের ছেলে। কচি তাল গাছ হলেও লাল কাঁকরের পুকুরপাড়ের তালগাছ। মানকড় তো যাসনি কখনও। গেলে বুঝতিস। সে কথা থাক। বাবা দেখেশুনে বলেছিলেন—বাবুগিন্নীর বড়ছেলেকে, বড়বাবু—মা বোধ হয় আর উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। এ আঘাত বড় খারাপ। এ থেকে শেষ পর্যন্ত ওই পা-খানা শুকিয়ে যেতে আরম্ভ হবে। আপনি ভাল করে দেখান। আপনাদের পয়সা আছে। পরে আপশোষ হবে। তার থেকে সময়ে দেখানো ভাল।

হেসে বলেছিলেন, মানকড় থেকে বর্ধমান—বর্ধমান থেকে

কলকাতা। কলকাতা থেকে শেষ পর্যন্ত কাশী। একখানা পা শুকিয়ে বাঁশের মত হয়ে গিছল—গোরা রঙ ছিল বাবুগিন্নীর—সোনার মত—শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কালো ফুলের মত।

তবুও চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। আবার হাসপাতালে দিয়েছিল মাকে। রমাদি আবার এসে দুবেলা দেখাশুনা করতেন।

মা হাসপাতালে যেতে চায়নি। সে চেয়েছিল গোপার বিয়ে দিতে। ফিকসড ডিপোজিটে ছ হাজার টাকা বেড়ে সাত হাজারে পৌঁচেছে। একটি পয়সা ভাঙেননি। মা রমাদিকেই বলেছিলেন—রমা এ টাকা আমার জন্যে খরচ করবে আমি পারব না। ও টাকায় গোপার একটা বিয়ে দিয়ে দে।

—বিয়ে ? ছ হাজার টাকায় কি বিয়ে হবে খুড়ীমা ? ও হয় না।

—হয়। হতেই হবে।

—না হবে না। ওই টাকায় একটা থার্ডক্লাস ফোর্থক্লাস ছেলে দেখে তরে হাতে দেবেন ; সারা জীবন শুধু ছেলের পর ছেলে হবে, একপাল ছেলে। তারপর না খেয়ে টি বি হয়ে মরবে। আর যদি ছেলেটা মরে তো বিধবা হয়ে ভাত রান্নার কাজ খুঁজবে। না হয়—। থাক্ সে না হয় নাই শুনলেন। ছেলে নিয়ে বিধবা হলে তো সোনায় সোহাগা—। আর আপনি বেঁচে থাকলে শুকনো পা নিয়ে বসে বসে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলবেন আর একটা এনামেলের বাটিসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে বলবেন—দয়া করে কিছু দিন মা-বাপরা। আমি ভালঘরের মেয়ে—ভাল ঘরের বউ—।

মা চীৎকার করে উঠেছিল—রমা—! সঙ্গে সঙ্গে সেও হাঁপিয়ে উঠেছিল। মনে পড়েছিল জ্যোতিকে।

হেসে রমাদি বলেছিল—ভয় পাচ্ছেন ? হ্যাঁ ভয় পাবার কথাই বটে।

—তোরাও তো করে খাচ্ছিস!

—খাচ্ছি হাত পা খালসা-ঝাড়া মোছা বলেই করে খাচ্ছি। বিয়ে হলে তো এর থেকে অনেক খারাপ থাকতাম খুড়ীমা। আমাদের বাড়ীর বউগুলোর মতো ছোট বউটা কাজের চেষ্টা করছে। শুনেছি সরকারী কাফেটেরিয়া না কি হচ্ছে—সেখানে চাকরী। মানে বাড়ীতে রাঁধুনী চাকরানী নয়, সরকারী খাবার দোকানে

চুপ করে গিয়েছিল মা। চুপচাপ বসে সারাদিন শুধু কেঁদেছিল।

রমাদি সেদিন মাকে সান্ত্বনা দিয়ে যা বলেছিল—তা আজও মনে অক্ষয় হয়ে আছে গোপার। আগুনের অক্ষরে লেখা একখানি কালের পুঁথির পাতা। বলেছিল—এ কালকে বুঝতে পারছেন না খুড়ীমা? কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে এলেন—এই সেদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন—বিছানা নিয়েছেন তো ক মাস। এমন কাল কখনও দেখেছেন? চালের দাম ডালের দাম নূনের দাম তেলের দাম এত কখনও দেখেছেন? আপনাদের বাড়ীর পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়ে ক্যানভাসারি করে—এ ভাবতে পারেন? বাপ মেয়েকে সঙ্গে করে হোটেলে নিয়ে যায়, দাদা নিয়ে যায়—। বিধবা যারা তার থাক। আমার বয়স হয়েছে খুড়ীমা—পঁয়ত্রিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে—আমার লজ্জার বয়স ফুরিয়েছে। খুড়ীমা—যৌবন জ্বালা মেয়েদের আছে। বড় জ্বালা। কিন্তু একগণ্ডা কি আধগণ্ডা ছেলে নিয়ে বিধবা হওয়ার জ্বালা তার থেকে অনেক বেশী—তার উপর তার সঙ্গে যদি অক্ষম বেকার স্বামী দেবতা সুদ্ধ শালগ্রাম শিলার মত কুলুঙ্গীতে বসে থাকেন তা হলে আর জ্বালার এপার ওপার নেই, তল নেই। গোপাকে পড়তে দিন—গোপা পাশটা করুক। তারপর ওর ভার ওর নিজের; দেখেশুনে আপনার জনকে চিনে নেবে।

মা ফোঁস করে উঠেও চেপে গিয়েছিল। চোখ দুটোর ধ্বক-

ধ্বকানি আজও মনে পড়ছে গোপার। সম্ভবত দিদি নীপার কথা বলতে চেয়েছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন—নীপা যেমন ওসমানকে চিনে নিয়ে ছুটে পালিয়েছে বাপের রক্তে পা চুবিয়ে চরণচিহ্ন এঁকে রেখে—অথবা সৌরীনের কথা বলতে চেয়েছিল।

সে আর বলতে দেয়নি রমাদি। বলেছিল—নিজে সেরে উঠুন আগে। তারপর ওসব কথা হবে। ভাববেন, করবেন। হাসপাতাল থেকে আর একবার ঘুরে আসুন।

মাকে বাধ্য হয়ে চুপ করতে হয়েছিল।

বিচিত্র জীবন—বিচিত্র সংসার—বিচিত্র এই সংসার রঙ্গমঞ্চের নাটক। আশ্চর্য তার গতি।

মাকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিল। বিকেলবেলা। মা শুয়েছিল রমাদির কোলে মাথা দিয়ে পিছনের সিটে। আবার একটু জ্বর দেখা দিয়েছে। যন্ত্রণাটা বেড়েছে। মা প্রায় দাঁতে দাঁত টিপে সহ্য করে শুয়ে আছে। মায়ের পায়ের দিকে বসে আছে গোপা। বসে ঠিক নেই। অন্তত সিটে নেই, মায়ের পা আছে সিটের উপর, সে কোন রকমে বসে আছে কিনারায়। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে রমাদির ভাইপো রণজিৎ—বড় ভাইয়ের মেজ ছেলে। ট্যাক্সিখানা কাঁটাপুকুর হয়ে এসে সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যুতে পড়ে মেডিকেল কলেজ যাবে। সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যু থেকে মির্জাপুরে বেঁকে গিয়ে মেডিকেল কলেজের কলেজ ষ্ট্রীট ফটকে ঢুকবে।

হঠাৎ রণজিৎ কাউকে লক্ষ্য করে বলে উঠেছিল—খে-ল-তে যা-চ্ছে-ন? কার সঙ্গে খেলা?

জবাবে আওয়াজ ভেসে এল, কারুর কথাগুলো স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি।

রমা গোপা দুজনেই ফিরে তাকিয়েছিল। তাকিয়েছিল ফুটপাথের

দিকে। কিন্তু না। যার সঙ্গে রণজিৎ কথা বলছিল—সে ফুটপাথে ছিল না, ছিল তাদের ট্যাক্সির পাশে আর একখানা ট্যাক্সিতে। রণজিৎই দেখিয়ে দিল—বললে, জ্যোতিদা। ট্যাক্সিতে যাচ্ছে—আমাদের পাশেই।

পাশেই ট্যাক্সিতে ইউনিফর্মপরা জ্যোতি বসেছিল, সঙ্গে আরও দুটি পাড়ার ছেলে—জ্যোতির চ্যালা বা শিষ্য। তারদিকে তাকিয়ে গোপা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। রমা কিন্তু বলেছিল—ছেলেটা বেশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছে রে! ইউনিফর্মে বেশ দেখাচ্ছে তো!

গাড়ীখানা চলছিল। জ্যোতির গাড়ীখানা পিছিয়ে পড়েছে। রাজবল্লভপাড়ার ওখানে সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যুর বাঁকে ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ীখানা দাঁড়াতে দাঁড়াতে জ্যোতির ট্যাক্সিটা আবার এসে পাশে দাঁড়াল।

জ্যোতি হাসলে—হাসলে সকলের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে রণজিৎকে—কোথায় যাচ্ছ?

—মেডিকেল কলেজ।

—কেন?

ঠাকুমার পা—বলতে বলতে ট্যাক্সিটা এগিয়ে গেল। রণজিৎ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে কথা ছুঁড়ে বললে—আবার বেড়েছে—।

আবার গ্রে ষ্ট্রীটের জংসনে গাড়ী থামল—সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পাশে এসে দাঁড়াল জ্যোতির ট্যাক্সি।

—আবার বেড়েছে? মানে—? অপারেশন—? কথাটা বলতে পারছে না জ্যোতি। তাকাচ্ছিল তারই দিকে।

রমাদি বিরক্ত হয়ে বললে—ইডিয়টিক ব্যাপার। দেখনা, রাস্তায় যেতে যেতে—। হুঁঃ। ট্যাক্সি আবার। এগিয়ে চলল। এবার

জ্যোতির ট্যাক্সি এগিয়ে গেছে। এ ট্যাক্সিওলা কথার সূত্রটা মনে রেখেই বোধ হয় ভেবেছিল কথাটা শেষ হওয়া দরকার। সে গাড়ীতে স্পীড দিয়ে জ্যোতির ট্যাক্সিকে ধরতে চলল।

এসে দাঁড়াল পাশে। জ্যোতি বলল—অপারেশন হবে নাকি ?

—তা জানি না। রণজিৎ বললে।

কথা এবার সে না বলে থাকতে পারলে না। বললে—না, নতুন করে প্লাষ্টার করে পা বেঁধে রাখতে হবে নইলে ছোট হয়ে যাবে।

না বলে তার উপায় ছিল না। মা অপারেশন শুনে চকিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। চোখ খুলেছিলেন, কপালে সারি সারি রেখা জেগে উঠেছিল।

রমাদি আবার বলেছিল—ইডিয়েট। বেশী খেলাধুলো নিয়ে যারা থাকে তারা অমনি হাঁদলাই হয়। খোঁজ নিচ্ছে—তাও চলন্ত ট্যাক্সি থেকে।

—এরই মধ্যে জ্যোতির গাড়ী এগিয়ে চলেছিল। এ গাড়ীটার ড্রাইভার এ্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে গাড়ীটার স্পীড বাড়াল। এসে সঙ্গ নিল জ্যোতির গাড়ীর।

রণজিৎ হেসে উঠেছিল সশব্দে।

জ্যোতিও হাসছিল—মুচকে মুচকে। কেমন করে যেন একটা রেস রেস খেলা জমে উঠেছে দু'খানা গাড়ীর মধ্যে। দুই ড্রাইভারই মেতেছে। এ খানিকটা এগিয়ে যায়—পিছন থেকে অন্যটা স্পীড বাড়িয়ে এসে সঙ্গ নেয়—ড্রাইভার ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হাসে। জ্যোতি হাসে প্রথম রণজিতের দিকে তাকিয়ে। তারপর সেই হাসিমুখে তাকায় সকলের অর্থাৎ গোপাদের দিকে। গোপার মুখেও হাসি ফোটে।

এবার তাদের গাড়ী এগিয়েছিল এবং রণজিৎ এবার সশব্দে হেসে

উঠেছিল। রমাদি পর্যন্ত হেসেছিলেন। হেসেই বলেছিলেন—কি হচ্ছে ?

বলতে বলতে জ্যোতির ট্যাক্সি এসে তাদের ট্যাক্সিকে ধরে—তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। হাসি মুখে জ্যোতি সকৌতুকে যেন—'হেরে গেল'—বলে খেলাঘরের বাচ্চা ছেলের মত হেসে চলে গেল।

এ ট্যাক্সিও স্পীড বাড়ালে। সামনেই বিবেকানন্দ রোড ক্রসিং। এ ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লাল সিগন্যাল ঘুচে গিয়ে হলদে হয়ে গেল। ট্যাক্সিটা সুযোগ পেয়ে তিনটে লাইনের ডান পাশ দিয়ে এসে একেবারে সিগন্যাল পোষ্ট পার হয়ে ছুটল। জ্যোতির ট্যাক্সি অনেক পিছনে।

রমাদিই এবার বললে—ওই পিছনে পড়ে গেল। ওই।

মা এবার জিজ্ঞাসা করলে—কে ?····

—আমাদের পাড়ার জ্যোতি বলে একটা ছেলে—

—আমি তো চিনি জ্যোতিকে।

—হ্যাঁ। জ্যোতি খেলতে যাচ্ছে—ট্যাক্সি করে যাচ্ছে। রণজিৎ আর ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা রেস লাগিয়ে দিয়েছে।

মাও হেসে বলেছিলেন—রেস ?—হ্যাঁ। তা লাগে। কিন্তু দেখো বাবা যেন ধাক্কা লাগিয়ো না।

ড্রাইভার এমন প্রমত্ত যে সে ছুটিয়েছে প্রাণপণ বেগে।

—এই—এই !—এই !

সে সাবধান বাণী ঢাকা পড়ে গিয়েছিল—জ্যোতির কণ্ঠস্বরে, তাদের চলন্ত ট্যাক্সি পাশে—আরও অধিকতর জোরে চলন্ত আর একখানা ট্যাক্সি থেকে সকৌতুক আহ্বান ভেসে এল—র-ণ-জি-ৎ।

রণ শব্দটা জোরে জিৎ শব্দটা খাদে।

বলতে বলতে মহাজাতি সদনের সামনে দু'খানা ট্যাক্সিই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। রণজিৎ হেসে উঠল সশব্দে।

তারাও হাসছিল। সে রমাদি এমনকি যন্ত্রণাকাতর মা পর্যন্ত।

বিচিত্র নাটক।

সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে একটা সুতোর দুটো প্রান্ত দু'জনে যে হাতে ধরে বাড়ী ফিরেছিল—তাতে এতদিন প্রায় তিন মাস পর্যন্ত কোন একটি গ্রন্থি পড়েনি—কোন একটি বুনন চলেনি। মনে হয়েছিল জ্যোতির ভূমিকা বোধ করি শেষ হয়েই গেল তার জীবন নাটকে। কিন্তু তিন মাস পরে আজ এই পনের বিশ মিনিটের মধ্যে এমনভাবে বুনন চলল—সেই সুতোয় যে কাঁটাপুকুরের মোড় থেকে মির্জাপুর সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যু জংসন পর্যন্ত বেশ কয়েক আঙুল চওড়া একটি কাপড়ের পত্তন হয়ে গিয়েছিল। সেবার সুতো যে ফিরেছিল—সে-কথা সে আজ এতকাল পরেও হিসেব করে মোটামুটি বলতে পারে।

রাজবল্লভ পাড়ার বাঁকের মুখে প্রথম—তারপর গ্রে ষ্ট্রীট—তারপর বিডন ষ্ট্রীট—তারপর বিবেকানন্দ রোড—তারপর মহাজাতি সদন—তারপর হ্যারিসন রোড এবং এর মধ্যে রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় ওভারটেকিংয়ের খেলায় বারপাঁচ কি সাত হবে।

বিধাতা বা অদৃষ্ট যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন এমনিভাবেই ওঠে।

আশ্চর্য। ওই পনের বা কুড়ি মিনিটের ওই সময়টুকু যদি কোন রকমে পরমায়ু থেকে বা জীবন থেকে বাদ দিতেন বিধাতা! তাহলে অন্তত এইটে হত না। ওই জ্যোতির সঙ্গে জীবনটা এমনভাবে জড়াতো না।

॥ দশ ॥

তা পারতো না কিন্তু তার বদলে অন্য কারুর সঙ্গে জড়াতে পারতো তো!

একটি মেয়ের জীবন শৈশব থেকে বাল্য, কৈশোর, পার হয়ে যৌবনে প্রবেশ করেও একান্তভাবে একক ধূলোয় লুটিয়ে বেড়ে এল এবং অনাসক্ত হয়ে পড়ে রইল—এমনটা হয় না এই সৃষ্টিতে। হয় না। পুরুষের জীবনেও তাই।

যদি বহুজনকে নিয়ে কারবার সুরু করে—সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক—তা হলেও বহুর মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে একটা গোপন কিছু রচনা করতে চায় সে। হ্যাঁ তা চায়। এবং গোপা মনে মনে নিশ্চয় করে জানে যে, যদি সেদিন ওই কুড়ি মিনিটের একটি বিশেষ কালব্যাপী একটি জীবন সূতোয় বুননের অধ্যায় নাই আসত তাহলেও অন্য কারুর সঙ্গে একটা বুননের পালা অবশ্যম্ভাবীরূপে চলত। যে কোন মেয়ে যাদের জীবনে বাল্য পার হয়ে কৈশোর, কৈশোর পার হয়ে যৌবন এসে অন্তত কিছুটা কাল কেটেছে—তাদের জীবনের গড়ন লক্ষ্য করে দেখো, দেখবে কোন একটা চারা গাছের কাণ্ড বা ডালে জড়িয়ে উপর পাকের চিহ্ন তার গড়নের মধ্যে রয়েছে। লোহার স্প্রিংয়ের পাকের মত পাকে পাকে জড়ানোর স্মৃতি বহন করছে।

জ্যোতি না এলে অন্য কাউকে জড়িয়ে ধরত তার মন তার জীবন। তবে তা ভেবে কি লাভ? জ্যোতি এসেছিল, তাকে সে জড়িয়ে ধরেছিল, তারই হাজার কথা আজ মনের মধ্যে ভিড়

করে এসে ঠেলাঠেলি করছে,—বলছে ভেবে দেখ বিচার করে দেখ —যা তুমি বললে জ্যোতিকে তা তোমার বলা ঠিক হল কিনা?

জ্যোতি আজ ষোল বছর তোমাকে জড়িয়ে ধরতে দিয়েছে নিজেকে। দেহ না হোক মন বটে। দেহই বা নয় কেন? যাক্ কতটা দিলে সত্য করে দেহ দেওয়া হয় সে হিসাব জটিল।

যাক্ সে হিসেব সে বিচার। কি হবে?

যা দিয়েছে তাই দিয়েছে। তাতে আপশোষ তার নেই। আজ দেওয়া নেওয়ার পালা গুটিয়ে নেবার মুহূর্তে বেদনা এবং দুঃখেই সে ভেঙে পড়েছে। এ দুঃখ এ বেদনা এ মুহূর্ত যেন তুফানের মত। এ বিক্ষোভ এ চাঞ্চল্য যখন থাকবে না তখন তুফান না থাক বেদনা দুঃখ থাকবে পারাপারহীন মোহনার নদীর মত। পারও থাকবে না তলও পাওয়া সোজা হবে না। শুধু তো জ্যোতিকে হারানো নয়—নিজেকে বঞ্চনা।

এইটেই বুঝি সেই ভাগ্যনিয়ন্তার তার জীবন নাটকের নির্দিষ্ট পরিণাম। তা না হলে—। তা না হলে—জ্যোতির সঙ্গে জীবনটা এমনভাবে জড়ালো কেন। সে তো রমাদির মতই হতে পারত। যত শোচনীয় পরিণামই হোক রমাদির এমন করে অনন্ত দুঃখের পারাপারহীন নদীতে ভাসার থেকে অনেক ভাল।

বিচিত্র রচনা। রমাদিই ডেকে এনেছিলেন জ্যোতিকে।

যে রমাদি প্রথম একদিন রাস্তায় জ্যোতিকে তার দিকে তাকাতে দেখে বলেছিলেন খুব সাবধান গোপা! খুব সাবধান! ওদের থেকে খুব সাবধান। সেই রমাদিই ওই ট্যাকসি রেসের দিন তিনেক পরে জ্যোতিকে সঙ্গে করে এনে বাড়ী ঢুকলেন।

—গোপা কাকে এনেছি দেখ!

ঘরের ভিতর থেকে গোপা উত্তর দিয়েছিল—কে রমাদি?

—ট্যাকসি রেসের জকিকে।

—ট্যাকসি রেসের জকিকে? মানে? বলে কৌতূহলের সঙ্গে রান্নাঘরের ভিতর থেকে উঁকি মেরে জ্যোতিকে দেখেই বিচিত্র-ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, অথচ যুক্তি তর্কের মতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার কারণ অন্তত কার্যে যা ঘটেছে—তার মধ্যে ছিল না। উচ্ছ্বাসের কারণটা ঠিক বাস্তবতা বিচার করে মেলে না। এ কারণ বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু। অথবা অতি সূক্ষ্ম বাস্তবতা, যাকে বাস্তবতা বলে ধরা যায় না। তুলনা অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যের মত। যার মূল্য বাঁদিকে কিছু না কিন্তু ডান দিক হলে হয় দশগুণ।

জ্যোতিকে দেখে সে উচ্ছ্বসিত কৌতুকে বলে উঠেছিল—ওঃ মা! রেস উইনার, জে-পি—কি ভাগ্যি?

রমা বলেছিল—বোকার মত বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমি রাস্তায় ঢুকেই লম্বা ঢেঙা ছোকরাকে দেখেই চিনেছি। এ সেই জকি দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোতি একেবারে লাজুক মেয়ের মত মাথা নিচু করে মৃদুমৃদু হাসছিল।

রমাদি বলেছিল—কিন্তু তুই উইনার বলছিস কেন? ও হারু। হেরেছে।

—তা বলছ কেন? জ্যোতিবাবুর গাড়ীই কিন্তু আগে ক্রস করে বেরিয়ে গেল। আমরা পরে বাঁদিকে বেঁকলাম।

—বাজে বকিস নি। দেখনা আমরা দিব্যি পৌঁছেটৌছে ঘরকন্না গুছিয়ে বসেছি ও এতক্ষণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খোঁজ করতে এসেছে—আমরা নিরাপদে পৌঁছেছি কিনা? আমাদের কষ্টটষ্ট হয়েছিল কিনা? জিজ্ঞাসা করলাম—আগে তোমার খেলার খবর বল?

জিতেছ না হেরেছ? বললে—হেরেছি। জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম হার? বললে, দুই—এক। বললাম—তোমাদের সে একটা কার ক্রেডিটে। বললে—আমার পাস, সেন্টারম্যানের স্কোর। এরপর ওকে উইনার কে বলবে!

নিজের থলিটা গোপার হাতে দিয়ে বলেছিল রমাদি দেখ ওর মধ্যে লেবু আছে আর চারটে ডিম আছে।

—ডিম?

হ্যাঁ। ফুটপাথে বিক্রী হচ্ছিল, কিনে আনলাম।

সেদিন অনেকক্ষণ বসে ওমলেটের সঙ্গে চা খেয়ে জ্যোতি বাড়ী গিয়েছিল। তার মনের মধ্যে জ্যোতিপ্রসাদ সম্পর্কে একটি প্রীতিরস যেন মনের প্রতিকোষ থেকে ক্ষরিত হয়েছিল, যখন সে চলে গেল তখন তার মনের ঘাসের উপর একটি নিটোল শিশির বিন্দুর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো কাব্য একটু বেশী হল। কিন্তু সেদিন, গোপা হলপ করে বলতে পারে যে, জীবনের ছোঁওয়া-ছুঁইয়ি, নাড়াচড়া, দেওয়া-নেওয়ার কারবার থেকে ওই শিশিরবিন্দুর মত অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী অলীক বা কল্পনার ব্যাপারটাই বড় ছিল।

—তাই থাকে। ওখান থেকেই সুরু।

নতুন করে সুরু করলে রমাদিদি। যে রমাদিদি পাড়ার পুলিশ সারজেন্ট বলে খ্যাত।

এর তিনদিন পর সেদিন রিমিঝিমি বৃষ্টির দিন সন্ধ্যের পর রমাদিদি ইউনিফর্ম পরা জ্যোতির সঙ্গে বাঁ হাতে একটা টাটকা ইলিশ ঝুলিয়ে নিয়ে বাড়ী ঢুকল। এবং কোলাহল করে বললে, ওরে জ্যোতি আজ একলা দুটো গোল দিয়েছে রে। ইলিশ মাছ

কিনে আনলাম বাগবাজার ঘাট থেকে—ওকে ইলিশ মাছ ভাজা খাইয়ে দে। কি সুন্দর খেলেরে জ্যোতি, তোকে কি বলব গোপা!

—তুমি খেলাও দেখলে না কি?

থমকে গেল রমাদি। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আজ বিকেলে সে হাসপাতালে খুড়ীমাকে অর্থাৎ গোপার মাকে দেখতে যায়নি গোপার সঙ্গে বিকেলে সাড়ে তিনটার সময় একসঙ্গে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার একটা জরুরী কাজ ছিল ধর্মতলায় বলে গোপা মেডিকেল কলেজে নেমে গেল, সে নামে নি, চলে গিছল ভবানীপুর। ওখানকার দু-তিনটে দোকানে তাকে সাপ্লাই দিতে হয় কয়েকটা জিনিস। বিশেষ করে ধূপকাঠি। তার সঙ্গে আরও কয়েকটা ওষুধ। এগুলো তার বাবার তৈরী ওষুধ।

এরমধ্যে জ্যোতির খেলা কখন দেখলে রমাদি? প্রশ্নটা খপ করে করে, ফেলেছিল গোপা। রমাদি থমকে গিয়ে সেকেণ্ড দুই কেমন হয়ে গেল তারপর বললে—ভাল। গোপা, বেশ জেরা করতে শিখেছিস তো! খেলাও দেখলে নাকি? হ্যাঁ দেখলাম! ট্রামে যাচ্ছিলাম, ট্রাম লাইনের পাশে মিউজিয়ামের সামনের গ্রাউণ্ডে খেলা হচ্ছিল। দেখলাম একজন একটা শট করলে। করলে খুব জোর। একেবারে গোলে ঢুকে গেল। পার্ক সার্কাস ক্রসিং-এর মাথায় ট্রামটা দাঁড়িয়ে। বেশ দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম যে শট করলে সে আমাদের জ্যোতি জকি। খুব উৎসাহ লাগল। মনে মনে বললাম—মরুগ গে ব্যবসা। খেলা দেখি আমাদের জকির। তারপর আরও একটা গোল দিলে জকি। খেলার শেষে ওকে নিয়ে চীৎপুরের ট্রামে বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ কিনে আনলাম। বাদলার দিনে ওকে ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি খাওয়াব।

এক নিশ্বাসে দম দেওয়া পুতুলের মত বলে গেল রমাদি। কখনও তাড়াতাড়ি, কখনও একটু থেমে, কখনও একটু ভেবে নিয়ে, কখনও বেশ খানিকটা হাসির সঙ্গে। এমনভাবে রমাদি কথা বলে না।

গোপা বুঝতে পেরেছিল যে রমাদি মিথ্যে কথা বলছে—গড়ে গড়ে বলছে রমাদি। মধ্যে মধ্যে সকরুণ হেসে অপ্রতিভাবে ঢাকতে চাচ্ছে।

* * *

রমাদি কথাটা স্বীকার করেছিল তার কাছে। নিদারুণ কষ্টের মধ্যে রমাদি তাকে কথাগুলো বলেছিল।

প্রায় আরও আট ন মাসের পর।

এই আট ন মাসে বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল।

না। কিসের বিস্ময়কর? কোথায় বিস্ময়কর! এই পৃথিবীতে যে সৃষ্টির নিয়মটি—প্রকৃতিই হোক আর ঈশ্বরই হোক—নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করতে গেলে এমনি কাণ্ডই তো ঘটবার কথা!

॥ এগার ॥

হঠাৎ রমাদি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। যেন হারিয়ে গেলেন।

গোপার মনে পড়ছে। রাত্রি তখন নটা দশটা—হঠাৎ ক্ষমাদি এসেছিলেন ওদের বাড়ী।

—গোপা! দিদি আসেনি?

—রমাদি?

ক্ষমাদি যেন মুখ ঝামটে উঠেছিল। নইলে আর কে? দিদি আর আমার কটা আছে?

সবিস্ময়ে গোপা বলেছিল কিন্তু রমাদি তো সেই রাগ করে চলে গেছে আর তো আসে না। তুমি তো জান!

—কি বিপদ দেখ দেখি।

—কেন? কি হয়েছে বড়দির?

—জানিনা। আজ ভোরে উঠে—। মানে সকাল থেকে বেরিয়ে গেছে—এখনও ফেরেনি।

ভাবলাম তোর এখানে যদি এসে থাকে।

ঘটনাটার আদি এবং অন্ত, অর্থ এবং সত্য ঠিক ধরতে পারেনি গোপা। যেন খানিকটা হেঁয়ালি হেঁয়ালি। রহস্য রহস্য মনে হয়েছিল। সকালে গিয়ে রমাদির ফিরতে তো রাত্রি হামেশাই হয়। রাত্রির শোতে সিনেমা দেখে রমাদি একলা বাড়ী ফেরে বারোটার পর। একালের বারোটার পর রাত্রির কলকাতাকে ভূতুড়ে কলকাতা মনে হয়। দোকান পাট ঘরদোর সব বন্ধ। রাস্তাঘাট থমথম করে। মানুষজন থাকে না, কেমন গা ছমছম করে। তারই মধ্যে

রমাদি ফেরে হনহন করে। সেই রমাদির জন্যে রাত্রি দশটার মধ্যে ক্ষমাদির এই উৎকণ্ঠা ভাবনার কারণটা যেন সে বুঝতে পারছে না। অথচ ক্ষমাদির কণ্ঠস্বরের উৎকণ্ঠার অন্তরালে একটা চাপা কিছু যেন পুঞ্জীভূত হয়ে জমে আছে।

ক্ষমাদি বলেনি একটা কথা। রমাদি ভোরবেলা বা সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়নি। রমাদি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে কাল দুপুরে। সকলে যখন ঘুমিয়ে ছিল বা আধ ঘুমন্ত হয়েছিল তখন সে বেরিয়ে গেছে। কেউ লক্ষ্য করে নি। করার কথাও তো নয়! দোকানে দোকানে অনেকের বাড়ীতে সে টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত জিনিস বেচে আসে যে মেয়ে, সে কখন বের হচ্ছে তারই বা কে খোঁজ রাখে। কি কি নিয়ে বের হল তারই বা কে খোঁজ রাখে। গতকাল দুপুর, মানে বেলা দুটো থেকে আজ বেলা দুটো—চব্বিশ ঘণ্টা এবং তারপর রাত্রি দশটা পর্যন্ত আট ঘণ্টা—সবসুদ্ধ বত্রিশ ঘণ্টা রমাদি বাড়ী নেই—বা বাড়ী ফেরেনি। ক্রমশ ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছিল যে রমার একটা স্যুটকেশ নেই, তার সঙ্গে তার ভাল শাড়ী ব্লাউজ সায়া যেকটা সেগুলো নেই, তার সঙ্গে আরও পরে দেখা গেল ক্ষমার কিছু সোনার গহনা ছিল, একটা হাতঘড়ি ছিল—তাও নেই।

ব্যাপারটা ঘটেছিল বিচিত্র পথে। নাটকীয় ভঙ্গীতে। কিন্তু গোপার মনে পড়ছে সোজাসুজিভাবে! রমাদি ঘর ছেড়ে চলে গিছলেন। ছত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার—সাঁইত্রিশ বছরে পা দিয়ে রমাদির জীবনে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সাঁইত্রিশ বছর যৌবনের অশান্ত কান্না কেঁদে কেঁদে হঠাৎ সেই অশান্তিতে গৃহ-ত্যাগিনী হল।

রমাদির মুখের খুব আগল বাঁধ ছিল না। তার মা অর্থাৎ

খুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলত—মেয়েরা মেয়ে হলেও মানুষ খুড়ীমা। রক্তমাংসে গড়া শরীর। পাথরও নয়, মাটিও নয়। আর যৌবনকাল যখন আসে তখন সে একটা জ্বালাও নিয়ে আসে। যৌবন জ্বালা দেহে জ্বলে মনে জ্বলে। জলে নেভে না, ধূলোবালি চাপালে নেভে না, শ্মশানের যত ভস্ম সব মেখে শিব যে শিব তাঁর এ জ্বালা চাপা পড়েনি। আবার নূতন করে বর সাজতে হয়েছিল। ব্রহ্মা ছুটেছিলেন কন্যা সন্ধ্যাকে বুকে ধরতে। দেবীদের কথা চাপা দেওয়া হয়েছে তবু অর্জুনকে দেখে বুড়ো বয়সে উর্বশীর কাণ্ড দেখে মর্ত্যবাসিনীদের পূজা করতে ইচ্ছে হয়।

কথাগুলো রমাদি গোপার মাকে বলত তখন সৌরীন এবং নীপার প্রসঙ্গের সূত্র ধরে। ওদের কথা উঠলেই মা ক্ষেপে যেতেন প্রায়। বলতেন—জন্তু! জন্তু! জন্তু ও দুটো। একটা পুরুষ জন্তু আর একটা মেয়ে জন্তু।

রমাদি সুরু করত মৃদুভাবে প্রতিবাদ করে। বলত না—না—খুড়মা আপনি বড্ড বেশী রূঢ় কথা বলছেন। মানুষ মানুষ রক্ত মাংসের দেহ তার। দেবতা তো নয়।

ক্রমে চড়ত রমাদি। শেষে গিয়ে যখন চরমে পৌঁছুতো তখন ফণা-তোলা সাপের মত মাথাখাড়া করে, দৃঢ়ভাবে নেড়ে নেড়ে বলত, না—না—না। এ আমি মানব না। না—না—না। এবং নিশ্বাস ফেলত সাপের মত। তার নাকটা লম্বা ছিল। সে লম্বা টিকলো নাকটির পেটী দুটো ফুলে ফুলে উঠতো। একটা উত্তাপ যেন বেরিয়ে আসত।

মা তার বলতেন—কেন? কেন একথা বলছিস? তুই কেন একথা বলবি? তুই তো নীপার চেয়ে বড়, সৌরীন থেকে বড়।

তোর এত বয়স হল। বাপ বিয়ে দিতে পারেন নি। তুই নিজের বাপকে সাহায্য করবার জন্য এই সারা শহরে ওষুধপাতি বিক্রী করে এনে বাপকে সাহায্য করছিস, কই তোর তো এমন মতি হয়নি। তুইতো পারিস নি—কারুর হাত ধরে চলে যেতে? পারিস তুই বল?

একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেত' রমাদি। একেবারে।

মা বেশী চাপাচাপি করলে—খুব ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ত—না—না—না। অর্থাৎ—তা পারে না সে তা পারে না।

সেই রমাদি—এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগিনী হল।

তার আগে যে কি করে কি ঘটেছিল, তা গোপা জানে না। শেষ মাস চারেক রমাদি তাদের সংস্রব ছেড়েছিল! ঝগড়া করে ছেড়েছিল। তার আগের কথাগুলি মনে পড়ছে গোপার।

* * *

সেই ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ির নিমন্ত্রণের পর, বোধ হয় মাসখানেক পর ডাক্তারেরা বললেন—এ পা আর ঠিক সারবে না। হাড়ের উপর যে সরু চিড়টা খেয়েছিল সেটা কমেনি সেটা বেড়েছে, সেটাকে পুরো সারানো সে অনেক ঝঞ্ঝাট। কেউ বলে—অপারেশন করে দেখতে হবে। তাতে সারতেও পারে না সারতেও পারে। কেউ বলে—অপারেশন করে হাড়ের ফুলো অংশটা স্ক্রেপ করে দিতে হবে। কেউ বলে—কিছু, কেউ বলে কিছু। মা বলেছিল—থাক্ আমি বাড়ী যাব।

মা জেদী মেয়ে। মাস দেড়েক পর হঠাৎ বাড়ী ফিরে এল। সম্পূর্ণ হঠাৎ। সে থাক। তার আগে এই দেড় মাসের কথা মনে পড়ছে। এই দেড় মাসের মধ্যে জ্যোতি খুব কাছে এসে গেল। সে নিয়ে এল রমা দিদি। ওই খিচুড়ি ইলিশের ভোজের পর থেকে

তিনিই তাকে নিয়ে নিয়ে আসতেন। জ্যোতি এসে অবশ্য মুখচোরার মত বসে থাকত। কথাবার্তা কম বলত। কথা বেশী বলত রমাদি, বেশী কেন—সব কথাই সে বলত। গোপাও অবশ্য বলত কিছু কিছু; কিন্তু জ্যোতি একেবারেই কথা বলত না। সে শুনত এবং মৃদু মৃদু হাসত। এবং সুযোগ পেলেই প্রসন্ন হৃষ্ট দৃষ্টিতে গোপার দিকে তাকিয়ে নিত। গোপা অনেকটা সহজভাবে তাকাতে পারত, লজ্জার হেতু হয় তো ছিল, কিন্তু সেটাকে সে জয় করতেই চাইত। আমল সে দিত না তার কুমারী হৃদয়ের লজ্জাকে। যে লজ্জা স্পর্শকাতর লজ্জাবতী লতার মত সবুজ হয়ে আপনি আপনি জন্মেছে—যে কোন দোলায় সে হাতের স্পর্শের হোক, বাতাসের হোক—লাগলেই সে লজ্জানত হয়ে নুয়ে পড়ে। কিন্তু ষোল আনা লজ্জাকে জয় করতে পারেনি। তবে কিছুটা পেরেছিল। সেটা খানিকটা রমাদির দৃষ্টান্ত তাতে সন্দেহ নেই। আর খানিকটা মায়ের অনুশাসন। যে মা তার—নীপাকে পার্ক সার্কাসে ওসমানের সঙ্গে এবং এ্যাংলোদের হ্যারিস জনের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশতে দিয়ে গৌরব অনুভব করত—সে মা এ নয়। এ আর একজন। সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তার নিজের কোন সংস্কারের বাধা নেই। স্বাধীনতার পরের কাল থেকে সারা ভারতবর্ষে যে ঢেউ এসেছে—যাতে পুরনো সংস্কার নিয়ম রীতি নীতি ভেসে যাচ্ছে তাতেই তার সব পুরনো সংস্কার ভেসে গেছে। সে নতুনকালের মেয়ে। কিন্তু তারই মধ্যে সে চিরকালের মেয়ে। পুরুষের কাছে সে আগে ধরা দেবে কেন। কেন সে তার চাউনীতে গলে পড়বে? কেন সে তার স্পর্শমাত্রে লজ্জাবতী লতার মত বেঁকে নুয়ে যাবে।

নারী হৃদয়ে একটা আকুল আকুতি আছে একটি পুরুষ হৃদয়ের জন্য—নারী দেহের রোম কূপে কূপে ব্যাকুল আগ্রহ আছে সেই

পুরুষটির সবল বাহুবেষ্টনীর মধ্যে এলিয়ে পড়বার জন্য। কিন্তু তার চেয়েও একটি প্রবলতর শক্তি তাকে দূরে স্থির হয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সে এক বিচিত্র নারী প্রকৃতিধর্ম, না সে এগিয়ে যাবে না। না।

তা সে যায়নি এবং জ্যোতিও নিজের লজ্জাকে এবং রমাদির অহরহ উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসতে পারে নি। তবু তাদের দুজনের হাতে ধরা সুতোর দুই প্রান্ত বার বার অদল বদল করে করে বুননের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।

এরই মধ্যে মা চলে এলেন—হাসপাতাল থেকে। নিজেই চলে এলেন। হাসপাতালে এমন করে শুয়ে তিনি থাকবেন না। থাকতে পারবেন না। এবং অপারেশনও করাবেন না। যা জীবনে আছে হবে।

মা চলে এসেছিল সকালে। সে এবং রমাদি দুজনেই বিস্মিত হয়েছিলেন। কই? কাল বিকেলেও তো কিছু বলনি।

মা বলেছিলেন—বলব কি? রাত্রে ভেবে দেখলাম। সারা রাত ঘুম হল না। সকালে উঠে চলে এলাম। ওদের বলে আসিনি।

—বলে এসনি?

—না।

মায়ের মুখখানা থম থম করছিল। গোপা বুঝতে পারেনি কি ঘটেছে। প্রগলভা রমাদি তাকে শাসন করে বলে উঠেছিলেন—আপনি চলে এলেন। নিজের খেয়াল খুশী মত চলে এলেন। বলছেন—পা যদি খোঁড়া হয় তো হবে। কিন্তু সারা জীবন আপনার সেবা কে করবে? বলুন?

মা ফেটে পড়েছিলেন—সে ভাবতে তোমাদের হবে না। নীপা গেছে, সৌরীন গেছে, গোপাও যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে—

—মা! চীৎকার করে উঠেছিল গোপা! —কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি। ওই বাড়ীর জ্যোতিকে নিয়ে কি চলছে বাড়ীতে? ইলিশ খিচুড়ি হচ্ছে, ডিম ভাজা চা হচ্ছে, মশলা মুড়ি সল্টেড বাদাম কেক দিয়ে বাড়ীতে পার্টি চলছে। কেন? কাল সন্ধ্যেতে কোন লোক আমাকে গিয়ে বলে এসেছে। তাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারিনে।

মুহূর্তে বোবা হয়ে গিয়েছিল দুজনে। দুজন মানে—সে এবং রমা দুজনেই। উত্তর খুঁজে পায়নি। কিন্তু কেন পায়নি সেকথা ভেবে আজ এতকাল পরে গোপা আশ্চর্য হচ্ছে। তাদের মেলা-মেশার মধ্যে তো কোন গোপন অভিপ্রায় ছিল না।

মা আবার বলেছিল—রমা তোমাকে কে বলেছে গোপার সঙ্গে জ্যোতির প্রেম করিয়ে দিতে? বল? আমার অনুমতি না নিয়ে— এসব তুমি কেন করতে গেলে?

—চুপ কর খুড়ীমা। আমি চলে যাচ্ছি। আমি ভাল বুঝেছিলাম তাই করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল—

গোপার সেদিন বিস্ময় লেগেছিল—প্রচণ্ড বিস্ময়! রমাদি বিবর্ণ মুখে অপরাধীর মত তার চেয়েও বেশী—চোরের মত যেন পালিয়ে গিয়েছিল। এবং সেদিন আসেনি।—তারপর দিন আসেনি। জ্যাঠামশায়দের বাড়ীতে গিয়েও রমাদিকে ধরতে পারেনি। রমাদি বাড়ীতে এসেও বাড়ীতে ঠিক থাকে না। যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত বেড়ায়। কারুকে কিছু বলে না।

ক্ষমাদি বলেছিল—জানিনে বাবা। বাবা ওকে যা করেছে একেবারে খাণ্ডারণী! বলতে পারব না।

দু-দিন পর রমাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রমাদিবলেছিল—আমার কাছে তুই আসিসনে গোপা। আমিও আর যাব না তোদের বাড়ী।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—দেখ আমার ইচ্ছে ছিল তোদের দুজনের ভাব করিয়ে দি। কিন্তু—

অকস্মাৎ যেন জ্বলে উঠেছিল রমাদি। বলেছিল—এরা মেয়েদের পৃথিবীতে আনে—এনে জন্তু করে রাখে। নিজেরা অক্ষম, বিয়ে দিতে পারে না। দেবার ক্ষমতাই নেই। বাড়ীর ঝি বাঁদী হয়ে থাকতে হয়। নিজেরা মেয়েরা যদি নিজের পথ নিজের ঘর গড়ে না নেয় তবে তারা যাবে কোথা? দাঁড়াবে কোথা? আর নেবে নাই বা কেন? সে একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা অথবা মনের ক্ষোভ মনের আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে গিয়েছিল। বলেছিল—আমরা ছাগল না ভেড়া না গরু? যার খুশী হাতে ওরা তুলে দেবে? তাও ক্ষমতা নেই। আমরা নিজেরা খুঁজে নেব আমাদের জন। কেন শুনব ওদের কথা? কেঁদে ফেলেছিল রমাদি।

জ্যোতিও আর আসে নি।

গোপার জীবন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। এ একি হল? রমাদি চলে গেল। জ্যোতি আর আসে না। রোগা মা যেন ক্ষ্যাপা আহত জন্তুর মত হিংস্র হয়ে উঠেছে—অহরহ তাকে আক্রমণ করছে কথা দিয়ে; কাঁদছে। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে সে কি করবে? এরই মধ্যে পেয়েছিল সে প্রথম প্রেম-পত্র জ্যোতির পত্র।

ছোট্ট চিঠি।

গোপা—আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। কতদিন বলতে চেয়েছি—কিন্তু পারি নি। আজ লিখে জানলাম। না জানিয়ে পারলাম না। ভালবাসি। আমি তোমাকে ভালবাসি। পৃথিবীতে বোধহয় এত ভালবাসা কেউ কাউকে বাসেনি।

চিঠিখানা একখানা বইয়ের ভিতর রেখে তারই সঙ্গে দিয়েছিল : পথের উপর।

গোপা কলেজ যাচ্ছিল। জ্যোতিও চলছিল। সে এ ফুটপাথে, জ্যোতি ও ফুটপাথে। বড় রাস্তায় পড়ে ট্রাম-রাস্তার দিকে মোড় নেবার দু-তিন মিনিটের মধ্যে পিছন থেকে দীর্ঘ পদক্ষেপে লম্বা জোয়ানও এসে তার সঙ্গ নিয়েছিল। সে এ ফুটপাথে, জ্যোতি ও ফুটপাথে। হঠাৎ তাকে দেখে বলে উঠেছিল—এই বইখানা

—মানে রমাদির কাছ থেকে নিয়েছিলাম। আপনাদের বই।

বইখানা নতুন একখানি গীতবিতান।

হাতে প্রায় গুঁজে দিয়ে চলে গিছল।

পরদিন ঠিক সেই জায়গায় আবার দেখা হয়েছিল। ঠিক সেই পিছন দিক থেকে এসে তাকে অতিক্রম করে চলে গিয়ে গতি মন্থর করেছিল। সে এ ফুটপাতে—জ্যোতি ও ফুটপাথে।

কোন কথা হয়নি। পরস্পরের দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে চলেছিল তারা। অতি মৃদু রেখায় আঁকা একটি হাসির রেখা দুজনের মুখেই ফুটে উঠেছিল।

পরের দিন আবার দেখা হয়েছিল। ঠিক সেইভাবে। আজ আবার চিঠি দিয়েছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল—সে চিঠিখানা অনায়াসে নিয়ে নিয়েছিল।

"চিঠির উত্তর দিলে না? তোমার সঙ্গে আমার অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। উত্তর দিয়ো।"

চিঠির উত্তর তবু সে দেয় নি। তবে তার দিকে তাকিয়ে একটি প্রসন্ন হাসি দিয়ে যতখানি নিজেকে জানানো যায় তা জানিয়েছিল। সেই দিনই ; হ্যাঁ সেই দিন রাত্রেই ক্ষমা এসেছিল তাদের বাড়ী।

—গোপা। দিদি আসে নি ?

দিদি অর্থাৎ রমা কাল থেকে বাড়ী ফেরে নি।

প্রথম বলেছিল ভোরবেলা বেরিয়ে এখনও ফেরে নি। তাই। ক্ষমা বলেছিল—বাবা উতলা হয়ে পড়েছে। বড্ড উতলা হয়েছে।

তার মা ক্ষমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল—কথা বলে নি, কথা শুনেই যাচ্ছিল। হঠাৎ বলেছিল—সত্যি কথা বল ক্ষমা, লুকোস নে। রমা বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে, না ?

এবার ক্ষমাদি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল—কাল দুপুরবেলা থেকে। কোন খোঁজ নেই। বিকেলবেলা আমি খোঁজ করতে বেরিয়েছিলাম কোন খোঁজ পাইনি। বাবা বলেছে গঙ্গায় ঝাঁপটাপ খেয়েছে নয় তো ট্রেনের তলায়টলায়—

॥ বার ॥

সেই বিষন্ন মলিন জীর্ণ ঘরখানায় মধ্যে ভাঙা তক্তপোষের উপর আবার একবার উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছিল যেন ভেঙে পড়েছিল আছাড় খেয়ে। কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে কেঁদে নিয়ে তবে শান্ত হতে পেরেছিল।

রমাদি গৃহত্যাগই করেছিল। খবর পাওয়া গিয়েছিল আরও মাস-তিনেক পর।

খবরটা এনেছিল জ্যোতিপ্রসাদ! জ্যোতিকেই খবর দিয়েছিল রমাদি। চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল "আমাকে উদ্ধার করতে পার? মনের ভুলে ঝোঁকের বশে তোমাদের উপর রাগ করে নিজের ভাগ্যের উপর শোধ নিতে, জীবনের জ্বালায় এইভাবে ঝাঁপ খেয়েছিলাম। তিলে তিলে মরছি। মরতে দুঃখ নেই। কিন্তু তার আগে তুমি একবার এস।"

রমাদি বিচিত্র রমাদি। অথবা বিচিত্র নারীজীবন নারীমন। তার কামনার কথা বলতে পারেনি। তাই বা কেন ঠিক হয়তো বিচার করে বুঝতেও পারেনি তাই রমাদি নিজের মুখেই তাকে বলেছিল।

রমাদি নিখোঁজ হওয়ার পর জ্যোতির জীবনের সঙ্গে তার জীবনের যে বুনন চলছিল তাতে ক'দিন ছেদ পড়েছিল।

মা চীৎকার করত। যেন অনুমান করতে পারত যে, জ্যোতির সঙ্গে তার দেখা হয় রাস্তায়। সে নিজে ভয় পেত। যদি জ্যোতির

সঙ্গে এখন জড়িয়ে যায় যে, তার টানে আর বাড়ী ফেরার পথ না থাকে ? মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ করত মন। বলত—না থাকে না থাকবে। কিন্তু সে শুধু বলাই, কথার কথা ; সে সাহস তার হয়নি। জ্যোতিও যেন আপনা থেকে দূরে সরে গিছল। সেও যেন ভয় পেয়েছিল। তিন মাস ধরে তারা সরে সরে ছিল ; দেখাও খুব কম হয়েছে। দেখা হলেও কেউ কারুর দিকে তাকায় নি।

জ্যোতি সেদিন গোপার মায়ের ভয়কে তুচ্ছ করেও এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের দোরে। মৃদু মৃদু কড়া নেড়েছিল আর ডেকেছিল কে আছেন বাড়ীতে ? গোপা দেবী আছেন ? গোপা দেবী ?

মা ঘুমিয়েছিল, গোপা জেগেছিল। সে বেরিয়ে এসে জ্যোতিকে দেখে চমকে উঠেছিল, মুখখানা যেন কেমন হয়ে গিছল, চাপা গলায় বলেছিল কি ? মা ভাবী চটে যাবে !

জ্যোতি বলেছিল চিঠিটা দেখ।

সে যখন চিঠিটা দেখছিল জ্যোতি তখন বলে গিয়েছিল মৃদুস্বরে —তোমাকে আমি বলি নি, বলতে লজ্জা হয়েছিল সুযোগও পাই নি। রমাদি সব সময় থাকতেন হাজির। রমাদি। রমাদি আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। আমি তাঁর থেকে কত ছোট তিনি আমাকে—। একটু থেমে বোধ করি সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বলেছিল তিনি আমাকে ভালবেসেছিলেন। সেসব চিঠি আমার কাছে আছে। তোমার মা সেদিন বকাবকি করাতে আমাকে পথে পাকড়াও করে বলেছিলেন আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল জ্যোতি। আমি ছুটে পালিয়েছিলাম। সেই দিন উনি পালিয়েছিলেন। আমি তোমাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—জরুরী কথা কিন্তু তুমি তার উত্তর দাও নি। না হলে বলতাম এসব কথা।

গোপা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল —আমি কি বলব?

—আমি কি করব বল? আমি যাব?

—জানিনে! বলে ঘরের দোর বন্ধ করে দিয়েছিল সে। কিন্তু পরের দিন সে এসে আবার কড়া নেড়েছিল। এবার আস্তে নয়। জোরে জোরে। বেরিয়ে এসে দেখেছিল জ্যোতি। এবং তার সঙ্গে পুলিশ।

রমাদি পালিয়েছিল একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে। হিন্দুস্থানীটা তাকে ছোরা মেরেছে। রমাদি হাসপাতালে মরছে।

রমাদি কাতরাতে কাতরাতে বলেছিল—জ্যোতি তুমি গোপাকে যেন ভালবেসো না। বিয়ে করো না। জ্যোতি। জ্যোতি। না। না। রমাদি প্রলাপ বকেছিল।

* * *

বিচিত্র, অতি বিচিত্র মানুষ এবং মানুষের মন। সেই দিনই ফেরবার পথে দুজনেই মনে মনে সংকল্প করেছিল তারা দুজনে বিয়ে করবেই। বিয়ে করতে তারা বাধ্য। বিধাতার এই নির্দেশ। কারণ ভালো তারা পরস্পরকে বেসেছে। সম্পূর্ণভাবে বেসেছে ভালো। যেটুকু বাকী ছিল আজই তা এই রমাদির মৃত্যুশয্যায় তার নিষেধকে অমান্য করে পূর্ণ হয়ে গেল। কেউ বা কোন অদৃশ্য নির্দেশ যেন পূর্ণ করে দিল। কিন্তু কেউ কাউকে বলে নি। মাথা হেঁট করে চলেই এসেছিল নীরবে।

১৯৫২ সাল। রমাদি মরেছে জানুয়ারীর পনের তারিখ।

আজ ১৯৬৭ সাল। মে মাস। ষোল বছর চার মাস কয়েক দিন। সেই বিবাহের দিনটির জন্য তারা প্রতীক্ষা করেছিল।

তুজনেই। গভীরতম আগ্রহে একটি দিন ও লগ্নের অপেক্ষা করেছে। সে সময় তার বয়স ছিল আঠারো। আজ তার বয়স চৌত্রিশ, চৌত্রিশ কেন পঁয়ত্রিশ। জ্যোতি বোধ হয় আটত্রিশ পার হল। আজ সেই প্রতীক্ষার শেষ হল—সেই শপথ মিথ্যে হয়ে গেল, একটি স্বপ্ন ভেঙে শূন্যে মিলিয়ে গেল, একটি ভালবাসার সমাধি হল।

হে ভগবান!

* * *

১৯৫২ সালের বোধ হয় সে এক বসন্ত দিন! তারিখ মনে নেই—কিন্তু সে ছিল এক বসন্ত-দিন।

রমাদি মারা গিয়েছিল জানুয়ারীতে। বসন্ত দিন—সে মার্চ মাস—ফাল্গুন। এই তু'মাস কয়েক দিন—তার সঙ্গে জ্যোতির দেখা হয় নি। মনে মনে ওরা সংকল্প করে এসেছিল—রমাদির শিয়রে দাঁড়িয়ে যে তারা তুজনে তুজনকে ভালবাসবে। কিন্তু বলেনি কেউ কাউকে। বাড়ী ফিরে ভয় হয়েছিল। কি ভয় সে আজ মনে পড়ছে না। কেন ভয় তাও বলতে পারবে না। তবে ভয় হয়েছিল। এবং পরস্পর থেকে যেন দূরে দূরেই থাকতে চেয়েছিল।—না। কাজ নেই নাথ। কাজ নেই।

বাড়ীতে মা গাল দিতে সুরু করেছিল তাকে। দিনরাত্রি গালাগাল। জ্যেঠামশায়ের বাড়ীতে অপরাধী দাঁড়িয়েছিল সেই। জ্যেঠামশায় থেকে ও-বাড়ীর সকলে বলেছিল—এটা ঘটল গোপার জন্যে।

পাড়ার লোকে বলেছিল—জ্যোতির মত লম্পট কেউ নেই। গোপার মত বিশ্রী মেয়েও পাড়ায় আর নেই।

জ্যোতিও বাড়ী থেকে নির্বাসিত হয়েছিল একরকম। বাউণ্ডুলের মত ঘুরত—ঘুরে বেড়াত। তু'মাস পর তাদের তুজনের দেখা

হয়েছিল বাজারে। সরস্বতী পূজোর আগের দিন। বসন্ত চতুর্থী ছিল সেদিন। বাজার করতে গিয়েছিল গোপা, একই আলুর দোকানে তার পিছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল জ্যোতি। হঠাৎ কার মৃদুস্বর কানে এসে ঢুকেছিল—গোপা!

গোপা চকিত হয়ে উঠেছিল—মাথা তুলে ফিরে তাকিয়ে জ্যোতিকে দেখে আত্মসম্বরণ করতে পারেনি, এক মুহূর্তে প্রসন্ন হাসিতে তার মুখখানা ভরে উঠেছিল—বলেছিল—তুমি?

—হ্যাঁ।

স্থান কাল ভুলে যেতে বসেছিল সে—সে বলেছিল, ওঃ আচ্ছা মানুষ তুমি—।

তার কাঁধে নিজের হাতখানি রেখে জ্যোতি বলেছিল—আলু কেনা শেষ করো আগে।

—যা ভিড়।

—সর, আমি ভিড় ঠেলে কিনি আর কিনে দি! কত?

—কত?—আধ সের।

বাজার শেষ করে ফেরার পথে বাজারেরই এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল দুজনে।

সে অনেক কথা।

জ্যোতিদের বাড়ী অনেকজনের সংসার। এজমালী বাড়ী। ওরা পুরনো বাসিন্দে, বাগবাজারে বাস করে, ভটচাজ পুরোহিতের কাজ। কাকারা কাজ করে কেউ করপোরেশনে কেউ মার্চেন্ট আপিসে কেউ ফিল্ম লাইনে এ্যাসিষ্টান্টের কাজ করে। জ্যোতির মা আছে, দুটো বড় বড় বোন আছে। গোপারা বৈদ্য। রমা এবং গোপার সঙ্গে জড়িয়ে যে রটনা রটল—তাতে ওদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছিল। বাপ মা কাকারা সকলেই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল

বাড়ী থেকে। সে এখান ওখান করে ফিরছিল। দিন দশেক আগে বাপ বিছানা নিয়েছে। করোনারী এ্যাটাক হয়েছিল। তাই ফিরেছে। তাদের সংসার এখন তার ঘাড়ে। কি ক'রে চালাবে জানে না। সে তো যজমান রাখতে পারবে না। মন্ত্র জানে না—সংস্কৃত জানে না—শাস্ত্র বোঝে না, বিশ্বাস করে না। ভাবছে কি করবে? প্রথমটা চুপ করে থেকেছিল গোপা, কি উত্তর দেবে?

হঠাৎ জ্যোতি বলেছিল—তবে বিশ্বাস ক'রো—ব্রমাদি সম্পর্কে আমার কোন দোষ নেই।

সে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেছিল—জানি।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর জ্যোতি বলেছিল, আর একটা কথা বলব?

—বল।

—তোমাকে চিঠিতে লিখেছিলাম।

প্রতীক্ষা করে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল গোপা। কথাটা সে জানে। তবু উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। একটু থেকে অকারণে একবার মৃদু গলা ঝেড়ে দিয়ে জ্যোতি বলেছিল—আমি তোমাকে ভালবাসি।

কি উত্তর দেবে গোপা?

—গোপা!

—বল।

—উত্তর দাও।

—কি উত্তর দেব?

—তুমি?

অতি মৃদুস্বরে গোপা বলেছিল—বাসি।

পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বাজারের মেঝেতে দাগ টানতে টানতে জ্যোতি বলেছিল—আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে?

গোপা চুপ করে থেকেছিল।

আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব। একটা চাকরী খুঁজে নি। না হলে—। বিষণ্ণ হেসে বলেছিল—দেখ আমি লেখাপড়া ভাল শিখিনি—দুবার বি-এ ফেল করেছি। অবস্থায় বরাবর গরীব। তবে অমানুষ নই। হলে—রমাদি—

—থাক। সে বড় দুঃখী। তার নাম করো না।

—আমাকে মাপ কর তুমি। ভুল হয়েছিল আমার।

—তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও। চাকরী খোঁজ। আমাকেও পড়া ছাড়তে হবে। আমার পঙ্গু মা ঘরে। সামান্য ক' হাজার টাকা আছে।—এই বাজারে—। আমিও চাকরী খুঁজব। দুজনে চাকরী পেলে তখন--।

এতক্ষণে গোপা মুখ তুলে জ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এবং সে মুখ—প্রত্যাশায় প্রসন্ন—এবং সহাস্য। জ্যোতির মুখের উপর সেই প্রসন্ন হাসিমুখের ছটা পড়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল তাকে—জ্যোতিও হেসেছিল।

কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে—চোখ নামিয়ে নিয়ে তারা বাজার থেকে বেরিয়েছিল। গোপা এইখানে বলেছিল—কিন্তু একটা কথা।

—কি ?

আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে কিন্তু যেখানে সেখানে পথে ঘাটে নির্লজ্জের মত হাসবে না। মিথ্যে মিথ্যে চিঠি লিখবে না। কেমন ?

—বেশ।

॥ তেরো ॥

একটি ছেলে একটি মেয়ে। বেলা ঠিক সাড়ে ন'টায় বাগবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে—দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসত। হয়তো বা একেবারের বদলে দুবার। কোন দিন এ আসত এক মিনিট আগে, কোনদিন ও আসত দেড় মিনিট আগে। তারপর গতি মন্থর করত; আস্তে আস্তে হাঁটত। একটু দাঁড়াত। এরই মধ্যে অন্যজন এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখত। হঠাৎ চোখে চোখ মিলত। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জ্বলত আলো, ঠোঁটে ফুটত হাসি। গোপা একটু ঝোঁক দিয়ে মাথা হেঁটে করে হাসিটুকু গোপন করে হন হন করে হাঁটত।

দেরী হয়ে গেছে। দেরী হয়ে গেছে। উঃ। কোন রকমে জ্যোতির সঙ্গ নিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে আউড়ে যেত। অর্থাৎ জ্যোতিকেই বলত।

একটি শব্দ ভেসে আসত—কেন? কি হয়েছিল?

—আবার কি? মায়ের বকুনী! রোগা মানুষ তো!

এক সঙ্গে দুজনের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ত।

মনে পড়েছে মা একদিন মাথা কুটছিল। সেই পলিটিকাল হাঙ্গামার সময়। বেঙ্গল-বিহার মার্জার নিয়ে হাঙ্গামা। রাত্রি নটার সময় জ্যোতির রক্ত মুছিয়ে কাপড় রাঙ্গা করে বাড়ী ঢুকেছিল! সেইদিন সে মাকে স্পষ্ট করে বলেছিল—হঁা জ্যোতিকে আমি ভালবাসি—ভালবাসি। এবং ভালবাসব। যতদিন বাঁচবো—ততদিন বাসব ভাল। তুমি তো তুমি—ভগবান বারণ করলেও

মানব না। ওকে আমি ভাল বাসব। কথাটা মনে করে মুখে মৃদু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল গোপার। কোন সাল সেটা? মনে পড়ছে না। তখন চাকরী তার তিন চার বছর হয়ে গেছে।

জ্যোতিরও চাকরী হয়েছে তখন। তার চাকরী হয়েছিল আগে।

আই-এ পাশ করতে সে পারেনি। লোকে বলেছিল—দোষ নেই। এই বাচ্চা মেয়ে—বাড়ীতে রোগা মা—সারা সংসার, পড়বে কখন? ওদিকে মজুত টাকা ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল। ছ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট থেকে সেভিংস এ্যাকাউণ্টে এসেছিল। এবং কমে আসছিল। সম্বল ছিল মায়ের ছুটো এবং তার একটা প্রাইভেট টিউশন। তিনটিতে পঁয়তাল্লিশ টাকা। একটা মানুষের সংসারও পঁয়তাল্লিশে চলে না। তা ছ'জনের সংসার তার উপর একজন রোগী।

এর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে দাদা সৌরীনের মধুবর্ষী পত্র আসত। তার মাইনে দেড়শো টাকায় তার চলছে না। তার উপর তার ছেলে হয়েছে, বাপের পরিত্যক্ত টাকা ছেলেতেই পায়। সে অনুগ্রহ করে টাকাটা তোমরাই নিয়ো বলেছিল বলেই তাদের এমন করে ষোল আনা আত্মসাৎ করা উচিত নয়। এখানে সে উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। তারা বলেছে— প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের যে-টাকা তার মা অভিভাবিকা হিসেবে ড্র করেছিল তার পাই পয়সা হিসেব দিতে হবে তাকে।

মা অবশ্য এতে ভয় খায়নি। টাকাও দেয়নি। তবে হঠাৎ চিঠি এল সৌরীনের ছেলেষ অসুখ। টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না। মা এবার টাকা পাঠিয়েছিল কিছু।

থাক সে সব কথা। টাকা নইলে জীবন চলে না কিন্তু টাকা জীবনের কথা নয়। টাকার কথা জীবন কেনা-বেচার কথা। টাকা

নইলে পেট ভরে না, তাই তাকে তখন পড়াশুনো ছেড়ে চাকরীর জন্য ছুটতে হয়েছিল।

চাকরী একটা পেয়েও ছিল।

বাবার আপিসে চাকরী। বাবা চাকরী করত বিলিতী মার্চেন্ট আপিসে, আপিসে বাবার সুনাম ছিল। বিশেষ করে তার উদার মতের জন্যে সায়েবরা ভাল বাসতো। সেইখানে একখানা দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে তখনও একজন পুরনো সাহেব ছিল—তার হাতে দরখাস্তখানা পৌঁছুতেই কাজ হয়েছিল, সমস্ত শুনে চাকরী তাকে একটা দিয়েছিলেন। চাকরী সামান্য। ডেসপ্যাচে খাম বন্ধ করা—চিঠির হিসেব রাখা ছিল তার ডিউটি। মাইনে আশী টাকা, ডি এ নিয়ে একশো কয়েক টাকা। সায়েব বলেছিল—তুমি আই-এ পাশ কর, মাইনে বাড়বে।

জ্যোতি খবরটা শুনে বলেছিল—এবার আমি একটা চাকরী পেলেই ব্যস। বুঝেছ!

গোপা তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। —মন তার বলেছিল —হ্যাঁ। দুজনের উপার্জনে তারা ঘর বাঁধবে।

তারপর আরও মাস কতক পরে চাকরী হয়েছিল জ্যোতির। চাকরী, আপিসে বসে কাজ করার চাকরী নয়। ডক ইয়ার্ডে মাল ডেলিভারী দেবার জন্যে। ডকের উপর গুদোমের মুখে বসে থাকত যারা তাদের মধ্যে একজন ছিল সে।

সেখানেও গেছে গোপা। দেখে এসেছে। ক্রেন বানান ধরণের মাল—লোহা লক্কড় প্যাকিং বাক্স, চটে মোড়া বড় বড় পেটী, মোটরকার, বিচিত্র জ্যোতির কর্মস্থল- ঝন ঝন ঠং ঠং থেকে বিপুল গর্জন—তার মধ্যে চীনে ক্যাপের মত ক্যাপ পরে ময়লা প্যান্ট ময়লা হাফসার্ট পরে জ্যোতি বলত—নামুক। নামুক। নামুক।

অথবা উঠাও-উঠাও। আরও। আরও।

তারই মধ্যে হঠাৎ লোহার গাদার উপর আছড়ে পড়ত আরও লোহার মাল।

জ্যোতির আগে ছুটি হলে সে এসে দাঁড়িয়ে থাকত—তার আপিসের সামনে, না হলে পায়ে পায়ে হেঁটে সে যেত স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপাশে—ডক গোডাউনের এলাকায় জ্যোতির খোঁজে। সেখান থেকে হেঁটে আসত এসপ্লানেড। সেখান থেকে বাড়ী। ছাড়াছাড়ি হত বাগবাজারের মোড় থেকে। সে চলত এ ফুটপাথ ধরে জ্যোতি চলত ও ফুটপাথ ধরে। গোপার উত্তর দিক—জ্যোতির দক্ষিণ ফুটপাথ ছিল নির্দিষ্ট।

কাঁটাপুকুরের মোড়ে দক্ষিণ দিকের ফুটপাথের মোড় থেকে নেমে দাঁড়ায় জ্যোতি। সিগারেট ধরায় কোণের দোকানের দড়ির আগুনে। উত্তর দিক থেকে রাস্তা পার হয়ে এসে তার গা ঘেঁষে পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে যেত গুড নাইট। কোনদিন বলত—আসি। কোনদিন বলত—কথাটা যেন মনে থাকে। কোনদিন মনের রং গাঢ় থাকলে একটা খোঁচা দিয়ে চলে যেত। কিছুদূর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসির সম্ভাষণ জানাতো।

জ্যোতি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কোন কোন সময়ে সেও বলত কথা—হঠাৎ দূরের কাউকে যেন সম্ভাষণ করে হাত তুলে বলত—বাই-বাই। আবার কাল। গুড নাইট। অথবা কাল একটু সকালে বেরুব। মনে থাকে যেন। বেটাছেলে তো—দূরের কোন কল্পিত মানুষকে উপলক্ষ্য করে তার দিকে লক্ষ্য করে কথাগুলো ছুঁড়ে মারত।

মধ্যে মধ্যে এর জন্যে অনুযোগ করত গোপা। —কোন দিন কে বুঝে ফেলবে—সেদিন হবে।

—কেউ ধরতে পারবে না।

—না, পারবে না। তুমি চেঁচাও—সে উত্তর দেয় না—লোকের সন্দেহ হবে না? চালাকী!

পারলে তো পারলে! আমি গ্রাহ্য করিনে। তুমি ভয় পাও কেন বলতো?

—কেন? মায়ের জন্যে! জান তো!

চুপ করে যেত জ্যোতি।

—তা ছাড়া। গোপা বলত—তোমারও এমন বেপরওয়া হওয়া উচিত নয়। দুই বোনের বিয়ে দিতে হবে। আমি বৈদ্যি ঘরের মেয়ে—আমার দিদি আমার দাদা যা করেছে সে তো হিন্দু সমাজ সহ্য করবে না। এত বেপরওয়া হয়ো না।

এসব কথা হত ওই ছুটির পর—গঙ্গার ধারে বসে। বসে বসে দু'জনে চিনেবাদাম অথবা চানাচুর অথবা ফুচকা খেত আর কল্পনা করত।

ভবিষ্যতের কল্পনা। দু'জনের মাইনে—দুশো পঞ্চাশ টাকা। গোপা ঘাড় নেড়ে বলত—এতে তিনটে এস্টাবলিশমেন্ট চলবে না চলতে পারে না! বিয়ে হলে আমার মায়ের একটা, তোমার মা বোনদের একটা, আমাদের একটা বাসা—ওতে চলবে না।

কোন ক্রমেই হিসেব মেলেনি। মেলাতে পারেনি।

জ্যোতি বলেছিল—কার কি হবে দেখে দরকার নেই গোপা! আমরা এস আলাদা সংসার পাতি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হতাশায় ক্লান্ত স্বরে গোপা বলেছিল—তাই কি হয়? মাকে—আমার মায়ের কথা বলছি—একেবারে খোঁড়া হয়ে গেছেন—পাখানা শুকিয়ে আসছে, বল কি করে ফেলে দেব? তাই পারি?

অনেকক্ষণ পর জ্যোতি বলেছিল—পারা উচিত।

—পারা উচিত ?

—নয় ? ওঁরা পারবেন না আমাদের মিলিত সংসারে থাকতে, আমরা কেন পারব ওঁদের জন্য কষ্ট করতে ? কেন যাব ত্যাগ স্বীকার করতে ?

ঠিক এই সময়ে এসপ্লানেডে যেন একটা কুটিল ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল।

চমকে উঠেছিল দু'জনে। —কি ? কি আর ? মানুষের চীৎকার। মানুষ গর্জাচ্ছে প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষোভে! ঝড়ের মত সমুদ্রের মত। বাংলাদেশকে বিহারের সঙ্গে এক করে মিশিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তারই প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে বাঙালী। আজ বিকেলে প্রতিবাদ সভা হবার কথা—মিছিল বের হবার কথা। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজছিল। উত্তর এল গুলির শব্দে। এবং তার সঙ্গে কোলাহল ভেসে এল।

তারা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিল। চল—বাড়ী চল।

ততক্ষণে বাস ট্রাম সব বন্ধ। এবং আন্দোলন যেন শুকনো ঘাসের আগুনের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দোকান হাট বন্ধ হয়ে গেছে। পথের আলো থাকতে থাকতে নিভে যাচ্ছে। ঘন অন্ধকারে ভরে উঠছে—ইঁট কাঠ পাথরের বাড়ী দিয়ে গড়া মহানগরীর পথঘাট। অরাজকতা বিশৃঙ্খলা সারা শহরের বুকের উপর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অরণ্যের রাত্রিকে যেন মূর্তিমন্ত করে তুলেছিল। সে অন্ধকার যেন রাত্রির অন্ধকার থেকে গাঢ় এবং ভয়াল। বড় বড় বাড়ীগুলো স্থাবর অন্ধকারের মত চারিপাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন কোন টানেলের মধ্যে বা খনির

মধ্যের অন্ধকার। দূরে ফায়ারিংয়ের শব্দ উঠছিল—কোলহল উঠছিল—দলবদ্ধ মানুষের রুষ্ট গর্জন। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বেগে ভারী লরী সম্ভবত পুলিশ ট্রাক বা ভ্যান চলে যাচ্ছিল দূরন্ত বেগে। এরই মধ্যে দু'জনে হাঁটছিল। ঘুরে ঘুরে চলছিল। বড় রাস্তা এড়িয়ে চলছিল। চলতে চলতে হঠাৎ পড়ে গিছল সংঘর্ষের মধ্যে। তারা পড়ে নি, সংঘর্ষাই ধাবমান হয়ে এসে তাদের নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। একদল মানুষ পুলিশের তাড়ায় ছুটে এসেছিল তাদের দিকে এবং আরও পিছিয়ে গিয়ে তাদের ফেলেছিল ঠিক মাঝখানে। হতভম্ব হয়ে গিছল তারা। ভেবে পায়নি কি করবে। কোন্ দিকে এগুবে। একদিকে পুলিশ অন্যদিকে ক্ষুব্ধ মানুষ। এরা ছুঁড়ছে টিয়ার-গ্যাস ওরা ছুঁড়ছে ঢেলা। পালাব কোন পথে, কোথায় পথ? মনে আছে জ্যোতি তার হাত ধরে বলেছিল—ভয় করো না গোপা। চলে এস। পাশে যে গলি পাব ঢুকে পড়ব।

—চল। কিন্তু গলিতে মোড় নিতে নিতে একটা ঢেলা এসে পড়েছিল জ্যোতির মাথায়। একটা আর্তনাদ করে উঠেছিল সে।

সেও আর্তভাবে বলেছিল, জ্যোতি!

—কিছু না চলে এস। এই গলিতেই ঢুকে পড়।

তাই ঢুকেছিল। রাত্রিতে যখন বাড়ী এসে পৌঁচেছিল তখন রাত্রি সাড়ে আটটা, মা আগ্নেয়গিরি মত বসেছিল। সে বাড়ী ঢুকল। মা তার দিকে তাকিয়ে দেখে চীৎকার করে উঠেছিল। কাপড়খানার সামনের দিকটা রক্তাক্ত। বাকীটা ধূলোয় কাদায় নোংরা। পথে একটা খোলা হাইড্রেন্টের জলের মধ্যে পা পিছলে পড়েছিল গোপা। মা বলেছিল গোপা! খুন হয়েছিস?

গোপা শান্ত শুষ্ককণ্ঠে বলেছিল—না।

—তবে? রক্ত লাগল কিসের? এত রক্ত? গোপা?

গোপা সেদিন নাম গোপন করে নি—বলেছিল—জ্যোতির। আসবার সময় দাঙ্গার মধ্যে পড়েছিলাম। একটা ঢেলা লেগে জ্যোতির মাথাটা ফেটে গেছে। সেই রক্ত।

মা চীৎকার করেই প্রশ্ন করেছিল জ্যোতি? জ্যোতি কোত্থেকে এল? তার রক্ত তুই মুছিয়ে দিতে গেলি কেন? গোপা।

—মা।

—বল।

—চীৎকার করো না মা। একটু থামতে দাও।

মা শোনে নি।

সে তখন বলেছিল, শোন মা, সে আমাকে ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসি।

—গোপা?

—চেঁচিয়ো না মা। জ্যোতিকে আমি ভালবাসি আমি তাকে ভালবাসব। তুমিতো তুমি মা, ভগবান বারণ করলেও আমি শুনব না। না।

—গোপা। মা প্রথম হিংস্র হয়ে চীৎকার করে উঠেছিল, এবার মায়ের থেকেও জোর চীৎকার করে উঠেছিল গোপা—সে-না-না-না।

পরদিন সে মায়ের সামনে দিয়েই জ্যোতির খোঁজ নিতে গিয়েছিল। কোন সঙ্কোচ ছিল না তার। জ্যোতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল পথে। জ্যোতিও আসছিল তার খোঁজ নিতে।

তারও বাড়ীতে হাঙ্গামা কম হয়নি। প্রচণ্ড ঝগড়া। রাত্রে ঝগড়ার জন্য হাঁড়ি চড়ে নি। জ্যোতির বাড়ীতে কথাটা ঠিক গোপন ছিল না। বোনেরা জেনে ফেলেছিল। তারা সেদিন তুফান

তুলেছিল। জ্যোতি তাতে টলে নি। বলেছিল—বেশ কালই আমি চলে যাব।

জ্যোতি গোপাকে বলেছিল—চল আজই যাব ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের ওখানে।

সে বলেছিল—দাঁড়াও আর একটু ভাবি। সে একটু ভাবা ভাবতে গিয়ে তার আর শেষ হয়নি।

॥ চৌদ্দ ॥

সে ভাবনার আর শেষ হল না।

পা বাড়াতে গেলেই গোপার চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে উঠত মায়ের মুখ। শুকিয়ে গেছে মানুষটা, আছে শুধু কঙ্কালটা আর তার উপর চামড়াখানা। আর আছে প্রচণ্ড ক্ষোভ ক্রোধ।

জ্যোতিকে মা দেখতে পারে না বরাবর। তার কারণ জ্যোতিদের বাড়ীটা নিতান্ত গোঁড়া হিন্দু ভটচাজ বামুনের বাড়ী। পুরুত ভটচাজের ছেলে জ্যোতিপ্রসাদ। জ্যোতি শুধু ফুটবল খেলতে জানে। তার মধ্যে জীবনের উচ্চমার্গীয় আর কিছু নেই। তার সেই প্রগতিশীল মা দাঙ্গার ধাক্কায় খানিকটা ধর্মমুখিনী হয়েও ওই মোহ ছাড়তে পারে নি। তা ছাড়া এ সংসারের সে যাই হোক গোপাকে যে কেড়ে নেবে বা নিচ্ছে তাকে ক্ষমা করতে পারে না এই মা-টি। না। সে পারবে না। তাতে যে যা বলবে বলুক। আঘাতে অভাবে পৃথিবীর প্রতি আক্রোশে তার মাথারও গোলমাল হয়ে গেছে। পাখানা শুকনো কাঠের মত শুকিয়ে গেছে। দিনে তিনবার অন্তত সেই পাখানাকে টানতে টানতে বাড়ীর দরজার দিকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলে ; বেরিয়ে যাবে বাড়ী থেকে, ভিক্ষে করে খাবে।

গোপা ধরে আনে।

মা তাকে শপথ করাতে চায়—বল তুই ওই জ্যোতিকে বিয়ে করবি নে ?

গোপা বলে না, তা কিছুতেই বলব না। বলতে পারব না। তাহলে তুমি যা খুশী কর।

মা চুপ করে দরজার চৌকাঠ ধরে বসে থেকে বলে—তাহলে বল আমি বেঁচে থাকতে বিয়ে করবি নে!

গোপা তা বলেছে। —বেশ তাই বলছি। তুমি মর—তারপর।

মধ্যে মধ্যে মা সে চীৎকারও করে, তুই আমাকে মেরে ফেলতে চাস।

গোপা সচরাচর উত্তর দেয় না। এক-একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে—বলে চাই। কিন্তু তা তো পারি নে। ভাবিও যে, তুমি মরবে, তুমি মরবে—কিন্তু তুমি অমর তুমি মর না। হয় তো আমি মরব তখনও তুমি বেঁচে থাকবে। আমার মৃত্যুর পর যা করতে চাও তাই করবে। ওই ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলে ভিক্ষে করে বেড়াবে। মা কেঁদে ওঠে ডুকরে, আমার মরণ তাকাচ্ছিস? সে বলে—তাকাচ্ছি—তাকাচ্ছি। না তাকিয়ে কি করব? তুমি যে নিজের দিক ছাড়া আমার দিকে তাকাবে না কোনদিন!

উদয়াস্ত কান্নার মধ্যে জীবন চলে। তবু এই কুম্ভীপাক থেকে বের হতে পারে নি সে।

জ্যোতির এ দুর্বলতা কম। তারও বাড়াতে এমনি কলহ-কোলাহলের মধ্যে জীবন চলে। সে বার বার বলেছে; ১৯৫২ সাল থেকে পনের বছর ধরে এই '৬৭ সাল পর্যন্ত অন্তত পনের শো' বার বলেছে আমাদের জীবন কি এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে গোপা? ওই বুড়ো হাবড়া পূর্বপুরুষদের মৃত্যু হল না বলে ওদের মৃত্যু কি আমরা মাথায় করব?

—তোমার দুই বোন?

—যাক। তারা আপনাদের পথ দেখুক। তোমার দাদা তোমার কথা ভেবেছিল? ওরা তো সংসারে কারুর সঙ্গ—

—থাক। আর বলো না জ্যোতি। আমার কষ্ট হচ্ছে।

—হয়তো। হয়তো আমার উপর ঘেন্না হচ্ছে তোমার। তা হোক কি করব? চারদিকে তাকিয়ে দেখ। মেয়েরা ছেলেরা স্বাধীনভাবে যাচ্ছে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রী আপিসে, বিয়ে করে চলে আসছে। কার দিকে তাকাচ্ছে তারা? তারা সকলে অন্যায় করছে? না করছে না।

গোপা বলেছে হয় তো করছে না। অন্যায় আমিই করছি। মানছি। কিন্তু—

—কি কিন্তু—

—ভাত খেতে বসলে একজন কেউ না খেয়ে সেদিকে চেয়ে থাকলে খেতে আমি পারি নে জ্যোতি। আমি দুর্বল। কি করব? তা ছাড়া।

—কি তা ছাড়া।

—এই তো পনের বছরের মধ্যে, তোমার চাকরী যাই যাই হল তিনবার। টেম্পোরারী থেকে পারমেনেন্ট হলে না। আমার চাকরীতে কোন রকমে মা মেয়ের খাওয়া-পরা চলে। এতে আমরা ঘর বেঁধে কি করব বল? ছেলে হবে—মেয়ে হবে—তাদের মুখে কি দেব? চালের কে-জি তিনটাকা, নুনের কে-জি পনর পয়সা; বল আমাদের কি করে চলবে? আমি এর থেকে বেশী দুঃখ করতে পারব না জ্যোতি। ছেঁড়া কাপড় পরে উনোনশালে বসে উনোনে জল ফুটবে ছেলেটা দুধের জন্যে আমাকে ছিঁড়বে—আমি তোমায় গাল দেব—তা আমি পারব না জ্যোতি—

—তা হলে?

—তা হলে অপেক্ষা কর জ্যোতি। আমরা পথ চেয়ে থাকি। সুদিনের—

—সুদিনের? তেতো হাসি হাসে জ্যোতি এ কথা শুনে।

গোপা বলে—কেন? সুদিন নিশ্চয় আসতে পারে।

—আকাশ থেকে ঝরে পড়বে?

—দিন আকাশে সূর্য উঠেই শুরু হয় জ্যোতি।

—সুদিন কিভাবে আসবে, সে সূর্যোদয় কিভাবে হবে বল শুনি।

—জানি নে। তবে আসবে না ঐ কথা মানি নে। ধর আমি লটারির টিকিট কিনেছি চারখানা। তা থেকে পেতে পারি। আমার নামে কিনেছি ননডিপ্লুম দিয়েছি 'জ্যোতি'। পঞ্চাশ হাজারও যদি পাই তাহলে সুদিন নিশ্চয় হবে আমাদের। ধর চাকরী ছেড়ে একটা ব্যবসা করবে তুমি—পাড়াগাঁয়ে কিছু জমি জেরাত কিনে ঘর করে নেব। সেখানে চাষবাস নিয়ে আমি থাকব। আমার মা তোমার মা-বোনেদের মাসে একটা করে টাকা দেব—

জ্যোতি বসে থাকত চুপ করে। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠত, পাড়াগাঁয়ে জমি জেরাত এ প্ল্যান ঠিক হবে না। বুঝেছ? তার থেকে বাড়ীতে ছোটখাটো কল—গেঞ্জি মোজা—এসব বসালে তুমি কয়েকটা মেয়ে নিয়ে তৈরী করলে আমি বিক্রী করব দোকান করে।

গোপা কতবার বলেছে—আমার ধারণা এবার আমি পাবই একটা প্রাইজ। আমার কি রকম ধারণা হয়ে গেছে।

৫৫ সাল থেকে ৬৭ সাল বারো বছর। বারো বছরে চার বারো আটচল্লিশখানা লটারির টিকিট তার বাক্সে মজুত করা আছে।

প্রতি বৎসরই টিকিট কেনা থেকে খবর বের হবার সময় পর্যন্ত তাদের জীবনে একটি প্রত্যাশার সময় এসেছে। মাস দুই বা তিন কাল তারা দুজনে ঠিক ওই কাঁটাপুকুরের মোড়ে পরস্পরের জন্য

প্রতীক্ষা করেছে, ঘড়ির কাঁটার মত দুজনের পা একসঙ্গে চলতে সরু করেছে, পূর্ব মুখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসেছে, মুখ দীপ্ত হয়েছে, চোখের চাউনীতে আলো ঝলসেছে। ছুটির পর নিত্য প্ল্যান হয়েছে। নতুন প্ল্যান। জ্যোতি মোটর ড্রাইভারি শিখেছে। ড্রাইভারি চাকরীর জন্য নয় এমনি শিখেছে কাজে লাগবে বলে। মনে গোপন ইচ্ছে ছিল একটা ট্যাক্সি নেয়। কিন্তু গোপা তা চায় না। মোটর ড্রাইভারি তার কোনমতেই পছন্দ নয়। গোপা খবরের কাগজ থেকে জায়গা জমি বিক্রীর বিজ্ঞাপন থেকে কাটিং করে তার ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর রেখেছে একটা খাতার পাতায় পাতায় পেষ্ট করে।

'কুড়ি বিঘা ধানী জমি সমেত একখানি ইটের গাথনী টালী ছাউনী বাড়ী একটি ছোট পুকুর—কলিকাতা হইতে বিশ মাইলের মধ্যে সস্তায় বিক্রয় হইবে। মূল্য চল্লিশ হাজারের মধ্যে। সত্বর অনুসন্ধান করুন।'

—খবর নিও তো টিকিট বিক্রী যারা করে তাদের কাছে কবে খবর বের হবে। কেমন? কাল মা যা করেছে না? যা হোক একটা করতেই হবে এবার। বুঝেছ।

—কি হয়েছে?

কাল দাদার একখানা চিঠি এসেছে।

—সৌরীনদার?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছেন?

—শরীর খারাপ হয়েছে খুব, কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে আসছেন। সেই নিয়ে সে যাচ্ছেতাই করেছে মা।

—কি? দাদাকে আসতে দেবেন না?

—না। আমিই না বলেছি। তাইতেই যাচ্ছেতাই।

—তুমি বলেছ?

—হ্যাঁ বলেছি। আর সহ্য করতে আমি পারছি নে জ্যোতি।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল জ্যোতি। —আমি তো তোমাকে কতদিন থেকে সাধ্য-সাধনা করছি। বাপ! রোজ আয়না দেখি আর হতাশ হই মাথার দিকে তাকিয়ে। মাথার চুলে পাক ধরতে সুরু করেছে।

—বাজে কেন বক।

কথাটা বলেছিল গোপা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ঝরে পড়েছিল। বয়স তারও পঁয়ত্রিশ পার হতে চলেছে। তালুর উপরে সিঁথির পাশে তারও দুগাছা চুল পেকেছে। নিত্যই সে সযত্নে ওইখানটা আয়না সামনে ধরে খুঁজে দেখে। এবং তোলা চুল এতটুকু মুখ বাড়ালেই তুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজে দুইয়ের জায়গায় তিন গাছা হয়েছে কিনা। তিন গাছা হতে দেরী নেই। হয়তো বা কালই হবে। অথবা হয়েই আছে—খুঁজে পায়নি।

সুতরাং আর দেরী করা চলবে না।

সে বলেছিল—হ্যাঁ জ্যোতি। আমি আর পারছি নে। দাদা হোক না হোক—যে হোক আর আমি পারছিনে জ্যোতি—এমন করে নিজেকে নিঃশেষ করতে আমি পারছিনে, পারব না। তুমি আমাকে নাও। জ্যোতি তুমি আমাকে নাও।

জ্যোতি তাকে দুই হাতে টেনে বুকে নিতে চেয়েছিল—সেই গঙ্গার ধারেই—সেই আধো অন্ধকারের মধ্যে। ওপারে পশ্চিম আকাশে হাওড়ার কল-কারখানার চিমনীগুলো কালো তর্জনী তুলে যেন শাসিয়েছিল। আশ্চর্যভাবে তাই তার মনে হয়েছিল কে যেন শাসাচ্ছে। সে ভয় পায়নি—লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল না—

না। সবুরই তো করলে আজ বিশ বছর। আর কটা দিন সবুরই কর না। কটা দিন তো!

পরের দিন দুপুরবেলা এসেছিল সৌরীন।

গোপা সন্ধ্যের সময় এসে চমকে উঠল। বাড়ীর বারান্দায় কটি ছেলেমেয়ে। দুটি কিশোরী মেয়ে, দুটি ছেলে, বাচ্চা, ছোটটার বয়স বছর পাঁচেক। অবাক হয়ে তারাও ওকে দেখেছিল, সেও তাদের অবাক হয়ে দেখেছিল।

—কে? এরা?

অনুমান করতে পারছে কিন্তু মন বললে না—বিশ্বাস করো না। হে ভগবান, তা যেন না হয়। না হয়! কিন্তু ঠিক তাই। বড় মেয়েটি এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল আপনি পিসীমা? গলা জিভ সব শুকিয়ে গেছল—নীরস কণ্ঠে জিহ্বায় সে বলেছিল তোমরা কে?

—আমি মলি। মলিনা সেন। সৌরীন সেন আমার বাবা।

—আমি ডলি। ডাবলু বাবলু এস পিসীমাকে প্রণাম কর।

—বাবা কোথা তোমাদের?

—ওঘরে ঠাকমার কাছে।

অবাক হয়েছিল—এরই মধ্যে পরিচয় তারা জমিয়ে ফেলেছে, তাদের অধিকারের জবর দখল শেষ করে ফেলেছে। তিক্ত হয়ে উঠেছিল সমস্ত জীবন।

ঘরের ভিতরে গিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেছল।

কঙ্কালসার দাদা বিছানায় শুয়ে আছে। মা বসে আছে শিয়রে। চোখের জল ফেলছে।

দাদার পেটে কি হয়েছে। ডাক্তারেরা বলেছে ক্যানসার। এখানে এসেছে দেখাবার জন্যে।

ছেলেগুলোকে নিয়ে এসেছে। বাধ্য হয়েছে নিয়ে আসতে।

কারণ মেয়ে দুটো বড় হয়েছে, বড়টার বয়স চৌদ্দ, ছোটটার বয়স বারো, ওদের মা নেই। মা মরেনি। ডাইভোর্স হয়ে গেছে। সে চলে গেছে আসানসোল থেকে মোকামা। সে এখন এক ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী। কথাটা চাপা ছিল, লেখেনি জানায় নি সৌরীন।

মায়ের স্নেহ পারাবার উথলে উঠেছে।

শিয়রে বসে কাঁদতে শুরু করেছে।

সৌরীন বলেছিল—বস গোপা। তারপর হেসে বলেছিল একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—বলেছিল তোকেই কষ্ট দিতে এলাম রে—

কোন উত্তর দেয়নি গোপা।

—আর যে কাউকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পেলাম না;রে?

এবার কেঁদে ফেলেছিল গোপা।

॥ পনের ॥

আজ সব মীমাংসা হয়ে গেল।

১৯৬৭ সালের মে মাসের রাত্রি। বাইরের স্যাঁৎসেতে পলেস্তারা ঘরের তক্তাপোষের উপর একেবারে ভেঙে যেন শুয়ে পড়েছে গোপা।

সব শেষ হয়ে গেল। জ্যোতিকে সে ফিরিয়ে দিল।

—না আর তা হয় না জ্যোতি। আর তা হয় না! না-না-না! আমি—আমি তা পারব না। আমার দ্বারা তা হবে না।

অর্থাৎ তাদের বিয়ে।

জ্যোতি রাগ ক'রে চলে গেল। গোপা বললে, আমাকে মাফ কর তুমি। আমার আর উপায় নেই।

আমি জানি এটা আমার দুর্বলতা। কেন—কেন—সৌরীন কি গোপার দিকে তাকিয়েছিল? না তাকায় নি। ওই ছেলেমেয়েগুলোকে তার মা স্বচ্ছন্দে ফেলে দিয়ে তার নতুন জীবনে নতুন ঘরে দিব্যি হাসছে, নিশ্চিত নিদ্রায় তার নতুন স্বামীর বাহু-বন্ধনের মধ্যে নিপীড়িত হয়ে জীবনরস আনন্দরস উপভোগ করছে—আর তুমি, তুমি কেন তাদের ভার ঘাড়ে তুলে নিয়ে এমন ক'রে নিজেকে নিজে দণ্ড দিচ্ছ—জীবনকে দুর্বহ করে তুলছ? কেন-কেন-কেন?

গোপার সে কথা মানে জ্যোতি। সে মানে। এর মধ্যে কোন পুণ্য নেই, কোন মহত্বও হয়তো নেই, এ ত্যাগ অর্থহীন। এবং গোপা তাদের ভার না নিলে তারা মরে যাবে, মানুষ হবে না—এরও নিশ্চয়তা নেই। গোপার মনের মধ্যে স্নেহের উৎসও ঠিক উথলে ওঠেনি। না ওঠেনি, তবুও ওদের ভার সে ফেলে দিতে পারবে না। না,

লোকলজ্জাও নয় চক্ষুলজ্জাও নয়, বাধ্যবাধকতাও নয়। তা নয়! মনের মধ্যে স্নেহ-সমুদ্র না উথলাক—স্নেহের একটি মজাদীঘি অন্তত আছে। রাঢ় দেশে ছোট ছোট ঝর্ণা আছে, যা দেখলে মনে হয় রেল লাইনের ধারের কাটিং ; ছোট্ট ; অত্যন্ত অগভীর কিন্তু অহরহ কানায় কানায় ভরা। নালা দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা জল বেয়ে চলে যাচ্ছে। এমনি একটি কি যেন আছে। হয়তো কুণ্ড বলা যায়। ওইটিই জীবন-রসের কুণ্ড। ওই রসের স্রোতের জন্যেই গোপা ওদের বিদায় করতে পারলে না।

পারা উচিত—তুমি বললে পারা উচিত।

নিশ্চয় উচিত। যে পারে—তার নিশ্চয় পারা উচিত।

গোপা হেরে গেল। পারলে না।

হাজারে হাজারে মেয়ে-ছেলে মিলে রেজেষ্ট্রী আপিসে যাচ্ছে বিয়ে করছে—স্বতন্ত্রভাবে ঘর বাঁধছে। বাঁধছে। হ্যাঁ বাঁধছে।

গোপারা তার থেকে নিচের।

ব্যঙ্গ করে তুমি বললে উপরের।

না। উপরের নিচের বিচার ছাড়। গোপা গোপাই। হয়তো সে একলাই। সে পারলে না। পারলে না। হেরে গেলে।

সৌরীন মারা গেছে দিন পনের।

ছেলেমেয়ে কটি এখানেই আছে। কোথায় যাবে? গোপা বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ভাবতে পারছে না, এদের ছেড়ে সে চলে যাবে।

জ্যোতি বলেছিল—বেশতো। ওরা থাক। আমরা ওদের নিয়েই ঘর বাঁধব।

গোপা ঘাড় নেড়েছিল—না।

—কেন ?

আমাদেরও তো ছেলে-মেয়ে হবে। তখন ?

জ্যোতি আরও আধুনিক কথা বলেছিল। গোপা তাতেও সম্মতি দিতে পারেনি। সে বিবাহের মানে কি ?

না-না। এ হয় না জ্যোতি।

না হয় আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর। যদি লটারিতে টাকা পাই !

জ্যোতি রাগ করে চলে গেল।

গোপা ভেঙে যেন পড়ে গেল। উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে তক্তপোষের উপর।

এত কালের একটি অতি সাধারণ নিতান্ত কম মূল্যের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। একটি অকিঞ্চিৎকর প্রত্যাশার মৃত্যু হল। হায় পৃথিবী।

* * *

মৃত্যু হল যেন মনের। মাটির পৃথিবীতে শবদেহের মত গোপার মধ্যে ওর মৃত আত্মার শব দেহটা পড়ে রইল অন্ত্যেষ্টির অপেক্ষায়, পথের ধারে পড়ে থাকা শবের মত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ভোরবেলা হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল গোপা।— বাজার যেতে হবে। টিউশন আছে একটা। আপিস আছে। উঃ বাপরে! এর আর শেষ নেই।

তবে নাটক শেষ। যবনিকা ফেলে দাও।

না দাঁড়াও, অপেক্ষা কর। জ্যোতি ডাকলে।—গোপা !

—কেন ? আবার কেন এলে তুমি। তুমি যাও।

—নাঃ। অন্য কথা বলতে এসেছি।

—বল।

—আজ আমার বিয়ে। রমাদির বোন ক্ষমার সঙ্গে। তোমাকে সাক্ষী হতে হবে।

জ্যোতি হাসছে। গোপা হাসলে—বেশ। তাই হবে।

বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। এরপর আর ঘটবার কি রইল? যবনিকা ফেলে দাও। নাটক ব্যর্থ নয়—সে ব্যর্থ, সে পারলে না সার্থক হতে। সে-ই ব্যর্থ। স্বীকার করছে তা।

॥ শেষ ॥